||জ্ঞানগঞ্জ পুঁথি ৩১||

বাঙলার হাট

একটি সাম্যবাদী পরম্পরা

তীর্থরাজ ত্রিবেদী

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ বিরোধী - কর্পোরেট বিরোধী চর্চা

‘বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা’
Haats of Bengal: A Communist Tradition

প্রচ্ছদ প্রজ্ঞা চৌধুরী

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮-এর পক্ষে জ্ঞানগঞ্জ ৩১ পুথি, ‘বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা’ প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৭০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

'প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন॥
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ডদলন নাম নিশান গাড়িল॥
চারিদিকে চারি রস কুঠরি পুরিয়া।
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া॥
চৌকিদার হরিদাস ফুকারে ঘনেঘন।
হাট করি বেচ কিন যার যেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছদ্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
ভাণ্ডারী চৈতন্য ভেল আর গদাধর।
অদ্বৈত মুন্ সী ভেল পরখাই দামোদর॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হঞা ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হঞা॥
দাঁড়ী ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর॥
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুই জন।
এইমত প্রেমসিন্ধু হাটের পত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোর।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল॥
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জনে॥

এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া॥
তাঁহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চূর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী॥
হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিল।
ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিল॥
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাঞা কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিগর আইলা যত স্বরূপের গণ॥
কারিকর লঞা রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোঁসাঞি যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গড়ন করিলা॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর হৈয়া কেহ বিতরণ কইল॥
নরোত্তম দাস আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ॥
এই রস বশ দেখি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লোভ অনুসারে মিলে রূপের কৃপায়॥
শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু এই সব কথা॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলারঙ্গ॥

প্রেমের সাগরে হংস শ্রীরূপ হইল।

ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক করিল॥

মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার।

কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র পাথার॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হৃদয়েতে ধরি।

চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥'

-'প্রণমহ কলিযুগে সর্ব্বযুগসার হাটপত্তন', কবি নরোত্তম দাস। পদটি ১৯৩০ সালে প্রকাশিত, ব্রহ্মচারী নিত্যস্বরূপ সম্পাদিত, "শ্রীহরি সাধক-কণ্ঠহার", ৩০-পৃষ্ঠায় এইরূপে দেওয়া রয়েছে।

ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের অসমাপ্ত আর্কেডস প্রজেক্ট হল উদ্ধৃতি এবং ঐতিহাসিক টুকরোগুলি দিয়ে বানানো একটি চমকপ্রদ গোলকধাঁধা, যা উনবিংশ শতাব্দীর প্যারিসের পুঁজিবাদী স্বপ্নের জগৎকে তার সবচেয়ে প্রতীকী ভোক্তা-স্থাপত্যের মাধ্যমে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছে। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে কারিগরের কর্মশালা থেকে - করাতের শব্দ, তাঁতের ছন্দ এবং সৃষ্টির উত্তাপের মধ্যে - বেঞ্জামিনের প্রকল্পটিকে যদিও গভীরভাবে অদূরদর্শী বলে মনে হয়। এটি ইউরোপীয় জ্ঞান-পরম্পরার একটি অনবদ্য নিদর্শন যা প্যারিসের তোরণগুলির দিকে তার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে এতটাই মগ্ন থাকে যে, শোষণের বিশ্বব্যাপী সে ঐ ঔপনিবেশিক নেটওয়ার্ক দেখতে ব্যর্থ হয়, যে উপনিবেশিক লুঠ ওই প্রাচুর্য সৃষ্টি সম্ভব করে তুলেছিল। আমাদের সমালোচনা তার পদ্ধতির নয়, বরং তার কাঠামোর।

বেঞ্জামিন তার 'ফ্যান্টাসমাগোরিয়া'র আবাহনে - পণ্যের চমকপ্রদ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হন যা তাদের উৎপাদনের প্রকৃত সামাজিক সম্পর্ককে ঢেকে রাখে। তিনি ফ্যাশন সামগ্রী, গ্যাজেট, শিল্প এবং স্থাপত্যকে সাবধানতার সাথে নথিভুক্ত করেন যা তোরণগুলিকে পরিপূর্ণ করে, যেগুলিকে পুঁজিবাদী যুগে স্বপ্নের চিত্র হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই তোরণটি কেবল প্যারিসের সর্বহারা শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন শ্রম দ্বারা তৈরি করা হয়নি, যেমনটি মার্ক্স বলতে চেয়েছেন। এটি বাংলার মতো বিভিন্ন উপনিবেশে নিয়মতান্ত্রিক বি-শিল্পায়ন ঘটানো এবং সেখান থেকে কাঁচামাল আহরণের উপর নির্মিত হয়েছিল।

পারি শহরের তোরণগুলিতে থাকা পুঁথিগুলিকে আবৃত করে রাখা মিহি মসলিন (একটার নাম আব-ই-রওয়াঁ, প্রবাহিত জল, কোনওটার নাম বাতাস বোনা) আমাদের কারিগর পূর্বজদের দান ছিল। বিলাসবহুল ভারতীয় চিন্টজ এবং সিল্ক প্রদর্শনকারী একই তোরণগুলি আমাদের নিজস্ব কারিগর অর্থনীতির ধ্বংসের স্মৃতিস্তম্ভ ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবল আমাদের পণ্য আমদানি করত না; এরা

আমাদের তাঁতব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছে, অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা তৈরি পণ্য থেকে কাঁচামাল উৎপাদনে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করেছে। প্যারিসের স্বপ্নের জগৎ ছিল আমাদের দক্ষতা হ্রাস এবং দারিদ্র্যের দুঃস্বপ্ন। বেঞ্জামিনের প্যারিস তোরণ হল, একটি ঔপনিবেশিক সরবরাহ শৃঙ্খলের উজ্জ্বল শেষ বিন্দু যা আমাদের পরাধীনতার সাথে শুরু হয়।

বেঞ্জামিনের মূল ব্যক্তিত্ব হলেন 'ফ্লানিউর' - অলস, বুর্জোয়া পথচারী যে শহরকে দর্শনের মধ্যে গ্রাস করে, এক বিচ্ছিন্ন, কাব্যিক বাতাসে তোরণের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই ব্যক্তিত্বটি তার আধুনিক অভিজ্ঞতার, অনুভূতির ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু ঔপনিবেশিক বিশ্বে ফ্লানিউর এর প্রতিরূপ কী? সম্ভবত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক অথবা ঔপনিবেশিক কর নীতি দ্বারা নির্মিত তীব্রতর দুর্ভিক্ষের পর বেঁচে যাওয়া ক্ষুধার্ত কৃষক।

'ফ্লানিউর' যখন চিন্তাশীল হওয়ার বিলাসিতা অর্জন করছে, তখন আমরা বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছিলাম। বেঞ্জামিনের দ্বান্দ্বিকতা - পুরাতন এবং নতুনকে একত্রিত করে আমাদের জাগিয়ে তোলে - অথচ সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বান্দ্বিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়: আধুনিক ভোগবাদীতার প্রতিভু 'পশ্চিম' এবং উৎপাদনকারী উপনিবেশের যুগপত নির্মাণকে চিহ্নিত করতে পারেনা। তারা একই মুদ্রার দুটি দিক, কিন্তু বেঞ্জামিন কেবল একটি দিক পরীক্ষা করেন।

বেঞ্জামিন উনবিংশ শতাব্দীর একটি "ইতিহাস" লিখতে চেয়েছিলেন, আধুনিকতার মধ্যে এর আদিম, পৌরাণিক রূপগুলি অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটি আসলে হয়ে উঠল শুধুমাত্র প্যারিস* এর ইতিহাস, যাকে আধুনিকতার ইতিহাস বলে ভুল সনাক্ত করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর একটি সত্যিকারের ইতিহাসের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে: কলকাতা বন্দর, কেবল প্যারিস তোরণ নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খাতা, কেবল প্যারিসের বণিকদের চালান নয়। তাঁতি ও নীলচাষীদের বিদ্রোহ, কেবল প্যারিস কমিউনার্ডদের বাধা নয়। আমাদের প্রতিরোধের - সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে শুরু করে কর্মশালায় অগণিত, অলিখিত নাশকতা পর্যন্ত - একটি রূপ ছিল, তবে এটি ছিল আর্কেডের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থার বিরোধী লড়াই। এটি বাদ দিয়ে, বেঞ্জামিনের সমালোচনামূলক প্রকল্পটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ধ্বংসাবশেষের প্রতি বেঞ্জামিনের এক বিষণ্ণ আকর্ষণ ছিল - কীভাবে এক যুগের মহৎ স্বপ্নগুলি পরবর্তী যুগের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। তিনি আর্কেডকে নিজেই উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধ্বংসাবশেষ হিসাবে দেখতে পারতেন। আমরা ধ্বংসাবশেষকে ভিন্নভাবে বুঝি। আমরা যে ধ্বংসাবশেষ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি তা ছিল আমাদের নিজস্ব শিল্প। ভেঙে পড়া মন্দির, নীরব তাঁত, পরিত্যক্ত ধাতব শিল্পের গ্রাম - এগুলো ছিল সেই ধ্বংসাবশেষ যা তৈরি করেছিল সেই শক্তিই, যারা প্যারিসে তোরণ নির্মাণ করেছিল। আমাদের প্রকল্পটি তাই

এই ধ্বংসাবশেষগুলিকে অতীতের স্বপ্নের নিদর্শন হিসেবে বিষণ্ণভাবে বিবেচনা করার নয়, বরং সক্রিয়ভাবে সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করার। কাঁথার সূচিকর্ম, তাঁতে বোনা শাড়ি এবং ডোকরা শিল্পের পুনরুজ্জীবন আধুনিকতা থেকে পালানোর প্রচেষ্টা নয়, বরং আমাদের নিজস্ব শর্তে এতে প্রবেশের প্রচেষ্টা - আমাদের কর্তাসত্তা [এজেন্সি] সমেত।

পূর্ববর্তী সমালোচনার উপর ভিত্তি করে, ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের 'আর্কেডস প্রজেক্ট'-কে বাংলার গ্রামীণ হাট এর সাথে সংযুক্ত করলে তার নিজস্ব একটি শক্তিশালী দ্বান্দ্বিক চিত্র তৈরি হয়, যা তার ইউরোপীয় কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে স্থানিকীকরণ করতে পারে।

***

সমগ্র বাংলার অর্থনীতি মূলত পারম্পরিক জীবিকা ও বৃত্তিনির্ভর, স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক বিনিময় এবং সীমিত বিনিময়ের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়েছিল। উপনিবেশের ইতিহাসে প্রতিটি বাজারের পর্যায়ক্রমিক বা স্থায়ী ধ্বংসের প্রমাণ রয়েছে। উপনিবেশ-পূর্ব সময়ে বাজারগুলি বিশেষভাবে শাসক এবং শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত পরিবারগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হত। শাসক তাদের পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাদের বাসস্থানের সংলগ্ন বাজার স্থাপন করেছিলেন। শাসক অভিজাত এবং তাদের কর্মকর্তারা জনতার বাজার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। যেমন আজিম-উস শান, যিনি দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বর্ধমানে বসবাস করতেন, তিনি শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং হুগলিতে একটি নতুন বাজার নির্মাণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'শাহগঞ্জ' কিন্তু লোকেরা তার প্রশংসায় এটিকে আজিমগঞ্জ বলে ডাকত। ১৮ শতকের প্রথমার্ধে রাজা কীর্তি চাঁদ (১৭০২-১৭৪০) কাঞ্চননগর নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দোয়ার হাট্টা বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জোয়ার সিং; দিওয়ানগঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিমভুন্দ বাবু; চন্দনপুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নন্দ কুমার রায়। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার পাশাপাশি সমগ্র বাংলায় আঠারো শতক জুড়ে বাজারের ঘনত্ব স্পষ্টতই বৃদ্ধি পেয়েছিল শতাব্দীর শেষের দিকে। এই অঞ্চলের গ্রামীণ ও শহুরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য বিভিন্ন আকারের হাট (পর্যায়ক্রমিক ছোট বাজার), (স্থায়ী বাজার) এবং গঞ্জ (স্থায়ী শস্য বাজার) ছিল। বিপুল বিনিময়ের স্থান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধমানে মোট ৩৮০টি হাট, গঞ্জ এবং বাজার ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি বর্তমানে মেদিনীপুরে অবস্থিত। (জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, গিরিধর সরকার, বর্ধমান ইতিহাসের সন্ধান, দে পাবলিশিং ২০১২)

ধর্মীয় সেবা দেওয়ার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় পর্যায়ক্রমে অনেক বাজার

এবং হাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জ্বালামুঠোর জমিদার রাধা গোবিন্দ এবং ভগবান গোপালের সেবা করার জন্য কুইহরমহল বিভাগের দুনুয়া গ্রামের বাসিন্দা নামচরণ দাসকে ১১৬৪ সালে পর্যায়ক্রমে দুটি হাট এবং ১১৯৫ সালে পর্যায়ক্রমে দুটি হাট দান করেছিলেন। সেই সময় এই জমিগুলি বনভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল। নামচরণ দাস দুটি হাট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার মধ্যে একটি বন পরিষ্কার করার পরে সাবগঞ্জ (ভগবান গোপালের স্থান) নামে পরিচিত ছিল এবং তিনি এই হাটগুলি থেকে কর আদায় করেছিলেন। তিনি সংগৃহীত কর রাধা গোবিন্দ এবং ভগবান গোপালের সেবা করার জন্য ব্যয় করতেন। ১৭৯০ সালে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার কর আদায় বন্ধ করে দেয়, ধর্মীয় ব্যয় বহন করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। [The Revenue Board Consisting of the Whole Council (RBCWC), 21st June, 1774, Vol-17, p..237]

বণিকরা যেসব মেলায় তাদের পণ্য সংগ্রহ ও বিক্রি করতেন, সেসব মেলা কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হত। আঠারো শতকের পূর্ববর্তী সময়েও গ্রামগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বিদ্যমান ছিল। সেই সময়ে, মেদিনীপুরে বিপুল সংখ্যক মেলা (প্রায় ১২৮টি) অনুষ্ঠিত হত। [Tilottama Mukherjee, Political Culture and Economy in Eighteenth Century Bengal: Networks of Exchange, Consumption and Communication, New Delhi, Oriental Blackswan, 2013, pp. 122,142; Asoke Mitra, Ed Compiled by Arun Kumar Roy . Paschim Benger Puja Parban o Mela, Delhi , Goverment of India, 1968]

এই মেলা এবং ধর্মীয় সমাবেশগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল গোপীবল্লভপুরের কালিয়াঘাই নদীর তীরে তুলসীচৌড়া, মহিষাদল, রথযাত্রা উপলক্ষে; এগ্রায় শম্ভুনাথের সম্মানে, শিবের সম্মানে আন্ধিরী; শিবের সম্মানে ঝারিপুর, ব্রাহ্মণীর সম্মানে কুতুবপুর এর মেলা। গোপীবল্লভপুরে চৈতন্যের সম্মানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় - যার মূর্তি এখানে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পূজিত হয়। একইভাবে, প্রতি বছর বাংলা চৈত পূজার মাসে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে 'মসনদ-ই-আলা' মূর্তির পূজার জন্য একটি ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠিত হত যা আধুনিক হিজলিতে এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই অর্থে, একটি ধর্মীয় 'ক্ষেত্র' অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, একথা ভাবা যেতে পারে। (বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ২০০৮)

শাসক কর্তৃক বাজার স্থাপন খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, পরবর্তীতে আমলারা কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রাচীনকালে হাট এবং গঞ্জ স্থানীয় বাণিজ্যিক অবকাঠামোর সাথে সমার্থক ছিল। বাজার স্থাপনের মাধ্যমে, উচ্চতর কর্তৃপক্ষ লাভজনক ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। একটি নির্দিষ্ট স্তরে, স্থানীয় পরিবারগুলি বিনিময় করত। স্থান এবং সময় সম্পর্কিত

নিয়ম দ্বারা বাজার প্রতিষ্ঠার নিয়মগুলি লোকমুখে সংহত হয়ে ওঠে। তখন বাজার একটি পৃথক কেন্দ্র ছিল না; বরং এটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক অবকাঠামোর একটি অংশ ছিল। দেখা গেছে, প্রাক-আধুনিক বাংলায় বাজার-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা ব্যাপক ছিল এবং এটি সরকারকে বাজার সংক্রান্ত নিয়ম বাস্তবায়নের উপরও প্রভাব ফেলেছিল।

জমিদাররা তাদের নিজ নিজ এলাকায় বাজার স্থাপন ও নিয়ন্ত্রন করতেন। যেখানে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন 'কোতোয়াল' যিনি বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, সেখানে সকল ধরণের বিশৃঙ্খলা রোধ করতেন, ওজন এবং পরিমাপের পাশাপাশি পণ্যের মান পরীক্ষা করতেন। [K.K. Datta, Alivardi and his Times, Calcutta; the World Press Pvt. Ltd, 1960, p.175]

এই ব্যবস্থা কোম্পানি-পূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে।

কেউ ঠিক ওজনের চেয়ে কম দামে কিছু বিক্রি করতে পারত না, অথবা দাম বাড়িয়ে অন্যদের ঠকাতে পারত না। গাজী নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিতেন, গ্রাহকদের পাশাপাশি দোকানদারদের সকলকেই তার আদেশ মেনে চলতে হত। 'বিরাশি ওজন' (৮২ ওজন) [বিরাশি সিক্কা - সিক্কা অর্থে মুদ্রা। বাদশাহি আমল এবং কোম্পানি আমলের মুদ্রাও 'সিক্কা' নামে পরিচিত ছিল। আশি তোলায় এক সের। বিরাশি তোলায় 'পাক্কা সের বা পাকি সের।' এর চেয়ে পাক্কা আর ভারি ওজনের একক আর ছিল না। এটাই বিরাশি সিক্কা। হাতের ৮২ সিক্কার চড়ের অর্থ পুরো শক্তি প্রয়োগ করে যে চড় মারে তা-ই 'বিরাশি সিক্কার চড়'- বিশ্বেন্দু] ছিল বাজারে আদর্শ ওজন। [Samasera Gajira Pnuthi- Typical Selections, Part- II, p.1853 See K.K. Datta, Alivardi and His Times, Calcutta; the World Press Pvt. Ltd, 1960, pp.175-176]

এফ. বুকানন ১৮০৮ সালে ৭০টি গঞ্জে, বাজার (১৩%) এবং ৪৫০টি হাট (৮৭%) গণনা করেছিলেন। [BR-Sayer, 24th September 1790: F.Buchanan. Account of the District, or Zila of Ronggopur, IOR-MSS Eur D 74]

দিনাজপুরের পার্শ্ববর্তী জেলায় ছিল ৩৪টি গঞ্জে ৩১টি বাজার (৯%), ২৬৫টি হাট (৮০%) এবং ৪৬টি গুজার (ফেরি সংগ্রহের জন্য ফাঁড়ি) ১৭৯০ সালে, এবং বুচানান জরিপে ৭২টি গঞ্জে ৫৬টি বাজার (১৫%) এবং ২৪৪টি হাট (৬৬%) রেকর্ড করা হয়েছে, ১৭ বছর পরে। [BR-Sayer. 16th June 1790; Do. 15th June 1791. Recounted from his description of each division (Thana). Eastern India , Vol.2, pp.622-85 & Appendix O to Book III]

১৭৯০ সালে বীরভূম জেলা থেকে কালেক্টরের প্রতিবেদন অনুসারে, হাট এবং বাজারের সংখ্যা (আনুমানিক) প্রায় ৭০টি। বর্ধমানের সমৃদ্ধ কৃষিপ্রধান জেলায় গঞ্জ, হাট এবং বাজার অসংখ্য', রাজশাহী জেলায় বাজার ও হাট ছিল-

১০১টি। [BR-Sayer , 5th July 1790 (A letter from C.Keating dated 16th June1790). PCR-Burdwan. 6th June 1774, Appendix No. 16: BR-Sayer , 23rd August 1790. BR-Sayer , 24th September 1791. Appendix No. 3.]

এই পরিসংখ্যান দেখায় বেশিরভাগ জেলায় খুব সীমিত সংখ্যক বৃহৎ বাজার-স্থান (গঞ্জ) ছিল যেখানে রপ্তানি-আমদানি ব্যবসায়ীদের তাদের অফিস এবং গুদামঘর ছিল এবং বহিরাগত বাণিজ্য লেনদেন করত। এই বৃহৎ বাজারগুলি ছাড়াও, গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শত শত ছোট বাজার ছিল যেখানে কেবল স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতেন।

বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট ১৭৯৩ সালে লিখেছিলেন, হাটের মধ্যে বিক্রি হওয়া জিনিসপত্র মূলত জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বুকানান বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন: "হাটগুলিতে... সপ্তাহে একবার বা দুবার পার্শ্ববর্তী সকলেই তাদের পণ্য কিনতে বা বিক্রি করতে, একত্রিত করতে এবং খুচরা বিক্রয় করতে চান। কৃষক তার জমির উৎপাদিত পণ্য, শিল্পী তার কর্মশালার উৎপাদিত পণ্য এবং জেলে তার পণ্য নিয়ে আসে। অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ী... রপ্তানির জন্য পণ্য কিনতে, আমদানি করা পণ্য বিক্রি করতেও উপস্থিত হন... (তবে, এই সমস্ত (হাটের) দোকানদারদের... আমদানি করা পণ্যের তুলনায় জেলার উৎপাদিত পণ্য এবং উৎপাদনের বিক্রি অনেক বেশি, যার পরিমাণ অবশ্য খুবই কম।" [Eastern India , Vol.2, pp.1004 & 1007]

আর্কেড এবং হাট আসলে, একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি পৃথিবী। ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের আর্কেড হল ভোগবাদের একটি আচ্ছাদিত রাস্তা যা শহুরে ফ্লনারকে পণ্যের কল্পকাহিনীতে মোহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বিপরীতে, গ্রামীণ বাংলার হাট হল উৎপাদন এবং স্থানীয় বিনিময়ের একটি উন্মুক্ত-বাতাসের সংযোগ, একটি স্থানিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তির সাথে স্পন্দিত যাকে আর্কেড মুছে ফেলতে চায়। এই দুটি স্থানকে পাশাপাশি স্থাপন করা কেবল একটি তুলনা নয়; এটি ১৯ শতকের বিশ্ব অর্থনীতির লুকানো সত্যকে প্রকাশের একটি কাজ।

বেঞ্জামিন দুর্দান্তভাবে দেখিয়েছেন যে আর্কেড কীভাবে পণ্যগুলিকে রহস্যময় করে তোলে। সুতার একটি স্পুল, রেশমের একটি বোল্ট, অথবা একটি ধাতব হাতিয়ারকে তার ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়। ভোক্তা কেবল চূড়ান্ত, চকচকে বস্তুটি দেখেন, এটি তৈরি করার শ্রমকে নয়। ফ্যান্টাসমাগোরিয়ার মূল বিষয় এই: উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিমোচন।

হাটে এই জিনিস ঘটানো অসম্ভব। কারিগর, কুমোর, কামার, তাঁতি তাদের পণ্যের পাশে বসে থাকে। উৎপাদন প্রক্রিয়াটি দৃশ্যমান। আপনি হয়তো সেই ব্যক্তির

সাথে দর কষাকষি করতে পারেন যিনি মাটির চাকায় পাত্রটি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। আপনি জানেন যে ঝুড়িতে থাকা মুরগিটি কাছের একটি গ্রাম থেকে এসেছে। হাট হল অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার একটি স্থান। উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক এখানে সরাসরি এবং ব্যক্তিগত। আর্কেড, পণ্যগুলিকে জাদুকরী করার প্রচেষ্টায়, পদ্ধতিগতভাবে এই সম্পর্কটিকে ধ্বংস করে।

আর্কেড এর মূল চরিত্র হল ফ্লানিউর, অলস ভবঘুরে যে তার চোখ দিয়ে খায়। তার উদ্দেশ্য হল অবসরযাপন এবং পর্যবেক্ষণ। সৃষ্টির ক্রিয়া থেকে তার বিচ্ছিন্নতা দ্বারা তাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। হাটের মূল চরিত্র হল উৎপাদক-বিক্রেতা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্রেতা। একজন কৃষক তাদের উদ্বৃত্ত (অতিরিক্ত পণ্য) নিয়ে আসে, একজন তাঁতি কিছু অতিরিক্ত শাড়ি নিয়ে আসে। তারা বিচ্ছিন্ন ভোক্তা নয় বরং নিযুক্ত উৎপাদক। ক্রেতা বেড়াতে আসে না বরং সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে আসে। হাটকে উপযোগিতা এবং সামাজিক বিনিময় দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। আর্কেড ব্যক্তিগত ভোক্তাকে বিচ্ছিন্ন করে; হাট সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বেঞ্জামিন আর্কেডকে মূলধন এবং পণ্যের গন্তব্য হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যেখানে এটি বিক্রি হয়, কিন্তু স্বপ্ন কেনার জন্য সম্পদ কোথা থেকে আহরণ করা হয়েছিল তা দেখেন না।

ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল একমুখী ফানেল। কাঁচামাল - পাট, নীল, তুলা, রেশম - বাঙালির ভূমি থেকে সহিংসভাবে আহরণ করা হয়েছিল। হাটের প্রাণবন্ত, স্থানীয় অর্থনীতিগুলিকে ইউরোপের কারখানা এবং মিলগুলিকে পরিবেশন করার জন্য পদ্ধতিগতভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। আর্কেড এবং অন্যত্র, উপনিবেশে তৈরি পণ্য বিক্রি করে উৎপন্ন সম্পদ ইউরোপে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এর খুব সামান্য অংশই বাংলায় ফিরে এসেছিল, এবং তারপরেও, সেটা ঔপনিবেশিক প্রশাসক এবং মুৎসুদ্দি অভিজাতদের কাছে গিয়েছিল, প্রকৃত উৎপাদকদের কাছে নয়। এই ব্যবস্থায় হাট একটি বৃত্তাকার, স্থানীয় অর্থনীতির প্রতীক হয়ে ওঠে যা সক্রিয়ভাবে শুকিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাকে কেবল কাঁচামালের সরবরাহকারী এবং তৈরি পণ্যের ভোক্তা করে তুলতে চাওয়া বৈশ্বিক ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক বিনিময়ের আভাস বজায় রাখার সংগ্রাম আমরা জারি রাখতে পারিনি।

বেঞ্জামিনের কাছে, প্যারিসের আর্কেডটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় যখন পুঁজিবাদের নতুন রূপ এর স্থান দখল করে। এর ধ্বংসাবশেষ বিষণ্ণ, একটি পুরানো স্বপ্নের প্রতীক। এটি একটি অতীতের ধ্বংসাবশেষ। আমরা যে ধ্বংসাবশেষের সম্মুখীন হয়েছিলাম তা কেবলমাত্র কোনও পুরানো বাণিজ্যের রূপ ছিল না, বরং একটি সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র ছিল। ধ্বংসাবশেষ হয়ে জেগে উঠেছিল আমাদের

নীরব তাঁত, আমাদের পরিত্যক্ত ধাতব কর্মশালা, ধানের পরিবর্তে নীল চাষ করতে বাধ্য হওয়া আমাদের পতিত জমি। হাটকে নিজে থেকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করানো হয়, কারণ এটি যে সম্প্রদায়ের হাতে ছিল, তার অর্থনৈতিক জীবনধারা প্যারিস এবং ম্যানচেস্টারের তোরণ নির্মাণের জন্য চুরি করা হচ্ছিল। আমাদের ধ্বংসাবশেষ অগ্রগতির প্রতীক ছিল না, বরং আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অনুন্নয়নের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল।

হাট আসলে আর্কেডের প্রয়োজনীয় প্রতিবিম্ব। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তোরণ থেকে বাঙলার হাট দেখতে পাননি। তার পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিকতার মোহকাজল মাখা নাগরিক ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার উপর কেন্দ্রীভূত থেকে গড়ে উঠেছিল। উৎপাদন-ভিত্তিক বনাম ভোগ-ভিত্তিক পণ্য সংবহনের, বৃত্তাকার অর্থনীতি বনাম নিষ্কাশন অর্থনীতির ফারাককে তাই তিনি দেখেননি।

বেঞ্জামিনের প্রকল্পের সত্যিকারের বিশ্বব্যাপী পাঠের জন্য এই দুটি স্থানকে সংলাপে একত্রে স্থান দিতে হবে। আর্কেডটি কেবল হাওয়া থেকে আবির্ভূত হয়নি; এটি আংশিকভাবে, বাঙলার হাটের মতো বিশ্বের বহু উপনিবেশ থেকে নিষ্কাশিত সম্পদ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। একজনের স্বপ্ন অন্যজনের দুঃস্বপ্ন দ্বারা টিকে ছিল। অতএব, বাঙলা আজ সেই সৎ ইতিহাসের দাবি করে - যেটি এমন একটি ইতিহাস যা প্যারিসের আচ্ছাদিত তোরণ থেকে গ্রামবাংলার রোদে ভেজা, ধুলোময় হাটকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মানচিত্রে, বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে সমান চোখে দেখে। লুঠের প্রাপ্য ফিরিয়ে দেয়।

জ্ঞানগঞ্জের পক্ষে

অত্রি ভট্টাচার্য

বাঙলার হাট :: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা

ক্ষমা সাহা। মুর্শিদাবাদ থেকে গাইতে এসেছেন। শুক্রবারের হাট, কবেকার চরি অনন্তপুর। পৌষ মাস থেকে এই হাটবারে প্রতিদিন দুই দলের কীর্ত্তন চলছে। রাত নামলেই ক্ষমা সাহার মঞ্চে ওঠার কথা। এমন সময় পরিচালকরা স্থির করলেন, ক্ষমা সাহাকে দক্ষিণা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম গায়কের গানেই রাত প্রায় কাবার হতে যায়। যথারীতি গাঁয়ের লোক বেঁকে বসলেন। এতদূর থেকে ক্ষমা সাহা এসেছেন কি শুধুই পয়সা নিয়ে যেতে! একজন অতিথি গায়িকার প্রতি এই অসম্মান চরিঅনন্তপুরের গ্রামবাসী কখনোই বরদাস্ত করবে না। গ্রামবাসীদের নির্দেশে পরিচালকরা বাধ্য হলেন, যতই রাত হোক, সূর্য উঠে যাক, ক্ষমা সাহা গাইবেন। অতঃপর ক্ষমা সাহা মঞ্চে উঠলেন। প্রস্তুতিপর্ব কেটে গেলে ধীরে ধীরে প্রথম যা উচ্চারণ করলেন,

"আমি হলাম হাটকুড়ানি। হাট শেষ হয়ে গেলে সবার শেষে যিনি আসেন, বিশাল মানবশূন্য হাটে যা কিছু মানবসৃষ্ট অবশিষ্ট পড়ে থাকে, কুড়িয়ে নিয়ে যান, সেই হাটকুড়ানি; আজ যেমন এসেছি, সবার শেষে, শেষতম ভক্তদের পদধূলি পেতে!"

আমরাও আজ একুশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে - চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আর অমানবিক আন্তর্জাতিক যুদ্ধবাজদের বাণিজ্য-চক্রের বদৌলতে বিস্ফোরিত বৈষম্যের যুগে বাঙলার অর্থনৈতিক পরম্পরা নিয়ে প্রচার ও আলোচনা করতে এসেছি যারা, শেষতম সম্বল হিশাবেই

আজ সকলে মিলে বেঁচে থাকবার জন্য ও নিজেদের সামষ্টিক ভবিষ্যদ নির্মাণ করবার জন্য 'হাট' ব্যবস্থার ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা, সাধারণ বৈশিষ্ট্যাদির কথা নিজেদের দেশের মাঠ, হাট ঘুরে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে পাঠকের সামনে প্রস্তাব করছি।

যেকোনো দেশের হাট তার অর্থনীতিতে কী ভূমিকা পালন করে — এটি পরিসংখ্যানের জাল দিয়ে বোঝা যাবে না। অর্থাৎ সংগঠিত ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক চাকার বাইরে এই তথাকথিত অসংগঠিত ক্ষেত্রের মূল বন্টন ব্যবস্থাটি কত টাকার দৈনিক ব্যবসা করে — তার তথ্যখানা থেকে এর বিশালতা কিঞ্চিৎ আন্দাজ করা গেলেও - এই বন্টন ব্যবস্থার 'ঐতিহাসিক' 'অর্থনৈতিক' বৈশিষ্ট্য ও তার শর্তগুলিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে তথ্যের ভাণ্ডার কম নেই, যা অনুপস্থিত আছে তা হল পুঁজির দেখানো 'উন্নয়ন'-এর ধামাধরা 'মুক্ত বাজার'-এর ভণ্ডামিকে — এই দেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক মুক্ত বাজার ব্যবস্থার বিকল্প দিয়ে নাকচ করবার সাহস। স্বভাবতই অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও গবেষণাগুলি অবচেতন ভাবেই হাটের ভিড়ে সমীক্ষা করতে যায় হাট দখল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। যথারীতি সম্ভাবনার ক্ষেত্র সেখানে বিভিন্ন 'পণ্যের' বাজার বোঝা, আর ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা। সমস্যা হল — এটি [হাট] 'আত্মনির্ভরশীল' স্থানীয় অর্থনীতির অংশ ব'লে মার্ক্সবাদীরাও একে সামন্ততন্ত্রের অংশ ঠাওরান, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার থেকে এর ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন। তাই তাদেরও সমীক্ষা হাটকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চরিত্র দেয়ার নামে বড় পুঁজির রক্ষণাবেক্ষণে 'বিকশিত' [থুড়ি নিয়ন্ত্রণ] করবার পাপকাজে সামিল হয়। আদতে হাটকে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিশাবে দেখা ও তার বৈশিষ্ট্য খেয়াল করবার বিপরীতে তাদের সমীক্ষা একে পশ্চাদপদ আত্মনির্ভরশীল সামন্ত অর্থনীতির অংশ হিশাবে বিচার করেছে বলেই হাটের আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাণিজ্যের ইতিহাস স্বীকার করবার ব্যাপারে তারা জ্ঞানপাপী থেকেছেন, এবং পারতপক্ষে গবেষণার নামে হাটের প্রকৃত অর্থনৈতিক সামাজিক তাদপর্য আড়াল করে সেসব ক্ষেত্রকে স্থানীয় উৎপাদকদের জন্য অলাভজনক করে তুলতে এবং ঘুরপথে ক্রেতাদের ধীরে ধীরে নিঃস্ব করে ফেলবার জন্য কর্পোরেট সংস্থাগুলির দুয়ারে তথ্যের ভাণ্ডার নিয়ে হাজির হয়েছেন। আমরা তিন পর্বে বিভক্ত এই লেখার প্রথম পর্বে হাটকে একটি মুক্ত প্রবাহকেন্দ্র হিশাবে চিনব। দ্বিতীয় পর্বে যে প্রকৃতই সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এই অবাধ বণ্টন ব্যবস্থার অন্যতম অক্ষদণ্ড, হাট যার উপস্থাপনা, তার পরিচয় করব; এবং তৃতীয় পর্বে আজকের পরিবেশগত বিপর্যয়ের জীবাশ্ম জ্বালানিকেন্দ্রিক অর্থনীতির বিপরীতে একটি প্রকৃতিবাদী অর্থনীতির অংশ হিশাবে ভবিষ্যতের মেরুদণ্ড হাটের মাধ্যমে পুঁজিবাদবিরোধী প্রগতি আন্দোলনের নির্মাণ প্রকল্প খুঁজব।

পর্ব এক॥ আন্তর্জাতিকতাবাদী মুক্ত প্রবাহ পরম্পরা

“সকল মতবাদের *পোষকতার এক একটি বিজ্ঞান বা তন্ত্র আছে। সেইরূপ আধুনিক সভ্যতার মতবাদের পোষকতার যে তন্ত্র তাহার নাম হচ্ছ সোসিওলজি বা সমাজবিজ্ঞান। এই সভ্যতার উপাসনা করিতে করিতে পাশ্চাত্য জগৎ আজ মহা বিপদজালে জড়িত হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান ইহা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ করিতে চাহে যে, রণতরি, টেলিগ্রাফ, ডাইনামাইট বোমা, ফটোগ্রাফ এবং রেল প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি জগতের অশেষ কল্যাণকর বস্তু। ফলতঃ এই সকল কিম্ভূতকিমাকার আবিষ্কারের ফলে মানবজাতির বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, এবং ঐ সকল আবিষ্কারের সাহায্যে সমাজের মধ্যে আলস্যপরতন্ত্র ফাঁকিদারের দল কেবলমাত্র নিজেদের সুখ ভোগের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে এবং তদ্বারা নিজেদের ফাঁকিদারী বজায় রাখিবার জন্য বল সঞ্চয় করিতেছে। এই ফাঁকিদারী সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিতগণ তাহাদের সমাজবিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহে যে, এই সভ্যতাই হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য এবং তাঁহারই নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত। সুতরাং জগতের সকল জাতি এককালে নিশ্চয়ই এই সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইবে।”*: রুশ মহাপণ্ডিত টলস্তয় [অনুবাদ: হরিদাস হালদার, বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি]

মানুষ প্রাকৃতিক ভাবেই একা বেঁচে থাকতে অক্ষম, এমন দলবদ্ধ প্রাণী। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের তাড়নায় তাকে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়, দলবদ্ধ থাকতে হয়। এই মূলগত কারণেই তার অন্যতম প্রধান সামাজিক সম্পর্ক হিশাবে বিনিময় –

সমাজ যতদিন আছে, ততদিন থাকবে আশা করা যায়। সংজ্ঞাত্মক অর্থে বিনিময় হল উৎপাদন ও ভোগের মধ্যেকার সেই মুহূর্ত যার শর্ত, বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় বিতরণ ব্যবস্থা থেকে, যাকেই রিকার্ডোর মতন আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদেরা অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয় প্রতিপন্ন করতে চান। ফলস্বরূপ, বিনিময়ের নানা রূপ সম্পর্কিত চর্চ্চাকেই 'আধুনিক' কালে অর্থশাস্ত্র তার একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়ে চেপেও দেন। অর্থাৎ যে মনুষ্যের ইতিহাস নাকি কয়েক লক্ষ বছর, তার সাম্প্রতিক 'আইনি' লুঠের পাঁচশো বছরের মাফিয়াবাজিকেই বিশ্ব-বিনিময় ব্যবস্থার একমেবাদ্বিতীয়ম রূপ হিশাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে খাইয়ে চলেন, ছাইচাপা দেন মুদ্রা ও বিনিময় নিরপেক্ষ জীবন ধারণের যেকোনো কার্যকলাপকে; লুঠতান্ত্রিক 'অর্থনৈতিক' নিয়মসমূহের বাইরে বিশ্বজুড়ে অজস্র সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাকে। এটা শ্রেণীগত ভাবে তাদের হাতেই সম্পাদিত যারা ঐতিহাসিক ভাবে উৎপাদকের শ্রম শোষণ করতে শ্রমপ্রক্রিয়াকেই উৎপাদকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে [কেন্দ্রীভূত করবার মাধ্যমে] নিয়ন্ত্রণ করেছে; যে শ্রম সৃষ্টিশীল বলেই গোরিলাগুলো মানুষ হল তার সৃষ্টিশীলতাকে বিনোদন বানিয়েছে। অর্থাৎ ক্রীতদাস প্রথা ও ভূমিদাস প্রথার ধারাবাহিকতায় মজুরিদাস প্রথা যে আধুনিক 'অবাধ' বাণিজ্যকে প্রতিষ্ঠা করল, তা বিনিময়ের মতোই উৎপাদন পদ্ধতিরও একটি একরৈখিক ইতিহাস-বিকাশের একচ্ছত্র চর্চ্চা করে যেখানে উৎপাদকদের শ্রমপ্রক্রিয়া অনুৎপাদক শাসকশ্রেণির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শোষিত, আর সৃষ্টিশীল শ্রম 'সাংস্কৃতিক উৎপাদন' বা বিনোদনের ব্যাপার। অকাদেমি নির্মিত এই ইতিহাসবোধই বর্তমান অর্থশাস্ত্রের অন্যতম ভিত্তি, যার সূত্রপাত হাজার হাজার জনগোষ্ঠীর যৌথ সম্পদ ও জ্ঞান দখল করা থেকে [আডাম স্মিথ বলেছেন জমি]। যা আগত প্রজন্মকে একা থেকে একাতর, অতঃপর মনুষ্যতর এক অন্য প্রাণী বানাতে চলেছে যে ক্রমে আরো অনুভূতিশূন্য, সৃষ্টিশীলতাহীন এক যন্ত্রমানব হবে; যাকে চাষ করতে হবে না, রান্না করতে হবে না, খাবার খেতে হবে না ও এইরূপে আরো সব হিশাব করলে যা দাঁড়াবে, তা হল একসময় কাজ বলতে তার একটা জিনিসই পড়ে থাকবে: নিরন্তর বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল, মহামারির সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া।

অতয়েব বিনিময়ের ক্ষেত্র হিশাবে হাটকে জানাবোঝার প্রাথমিক শর্ত হল আধুনিক অর্থশাস্ত্রের নিয়মতন্ত্রের বাইরে গিয়ে পিচের নিচে চেপ্টে রাখা ইতিহাসের আন্তর্জাতিক পরম্পরা হিশাবে হাটকে স্বীকার করা। এটি টপকে গিয়ে দিনাজপুর কিম্বা দক্ষিণ ২৪ পরগণা — যেকোন এলাকারই হাটে ঢুকি — কোনো নতুন তাদপর্য নাই।

বাঙলার সাপেক্ষে, এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পরম্পরার [হাট] ঐতিহাসিক গতিবিধি কিছুটা আজ আন্দাজ করা যায় অষ্টাদশ শতকের আগে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত মুদ্রা কড়ি দিয়ে। কড়ির বিশ্ববাণিজ্যে যাবার আগে জানা দরকার এই মুদ্রা মালদ্বীপের জেলেরা, বিশেষভাবে মহিলারা একটি সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস থেকে বানাতেন যার

বাণিজ্যে তারা লাভবান হতেন; কোনো হুকুমদার রাষ্ট্রের কর্পোরেট স্বার্থের প্রতি ভয় ও বিশ্বাস এই মুদ্রার ভিত্তি ছিল না; ফলত স্থানীয় বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনের উপস্থাপনা হওয়ার সুবাদেই অনিয়ন্ত্রিত হাট – বিভিন্ন প্রকারের ছোট বড় হাটই ছিল এই কড়ির ঐতিহাসিক বিশ্ববাণিজ্যের বহুধাবিক্ষিপ্ত কেন্দ্র।

সুলতানি শাসনকালে রূপোর মুদ্রা প্রস্তুতকারী বহু টাঁকশাল গড়ে উঠলেও এমনকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয়কালেও রূপোর মুদ্রা এই দেশে শখ, সঞ্চয়, উপহারের ব্যাপার ছিল। অপরপক্ষে কড়ি এযাবৎ সারা পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক খননেই পাওয়া গেছে। মালদ্বীপের স্থানীয়রা সারা বিশ্বে কড়ির বাণিজ্য করেছে।

জন ডেয়াল তাঁর "*প্রতিবেশী রাজ্য এবং অন্যান্য অঞ্চলের ওপর আধুনিক-পূর্ব বাঙলার মুদ্রা ব্যবস্থার প্রভাব*" নিবন্ধে দেখাচ্ছেন 'বাঙলা বিখ্যাত ছিল দামি প্রক্রিয়াজাত [ভ্যালু-আডেড] পণ্যের জন্যে যার চাহিদা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিল। এছাড়াও ঘোড়া, দামি ধাতু, বিশেষ কিছু চাহিদা সম্পন্ন পণ্য, বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার বিশেষ কিছু কাঁচামালের বাজার ছিল বাঙলা। এই পণ্যগুলির বাণিজ্যকর্ম সাধিত হত জটিল বাণিজ্য শৃঙ্খলদ্বারা যার মাধ্যম ছিল দামি ধাতু বা জীবিত বস্তু। আগেই বলেছি, বাঙলা যুক্ত ছিল তিব্বত [রূপোর জন্য], য়ুনান [রূপো আর সোনার জন্য], বার্মা [রূপোর জন্য], মালয় উপদ্বীপ [পূর্ব দেশিয় বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে], কেরল [পশ্চিম দিকের বাণিজ্যের জন্য] এবং মালদ্বীপ [কড়ির জন্য] – এর সঙ্গে। এই ব্যবসার মাধ্যম ছিল দারুণভাবে নথিবদ্ধ করা মুদ্রা বা মুদ্রামাধ্যম। প্রথম সহস্রাব্দ থেকেই বুদ্ধপথ এবং ব্রাহ্মণ্যপথদ্বারা ভারতের সাংস্কৃতিক বিকিরণে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার [সুবর্ণভূমি] সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এই ভারতীয় প্রভাবের বড় উদাহরণ হল পাঁচশ বছর [ছয় থেকে একাদশ শত] ধরে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে অরাকান, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া হয়ে ভিয়েতনাম পর্যন্ত দীর্ঘ অঞ্চলের নানান রাজত্ব জুড়ে ভারতীয় চিহ্নবিদ্যা লাঞ্ছিত রূপো মুদ্রাভিত্তিক ঘনিষ্ঠ আর্থব্যবস্থা গড়েওঠা। এই বাণিজ্য এবং আর্থব্যবস্থা ভিত্তিক মুদ্রাশৃঙ্খলার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল চন্দ্র, পয়ু, মোন, দারাবতী এবং চম্পাব রাজত্ব। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় এরা সকলেই একটা আন্তঃবাণিজ্য ব্যবস্থার অংশ বিশেষ। ত্রয়োদশ শতে বাঙলার সঙ্গে উত্তর ভারতে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা বৃহত্তর ভারতমহাসাগর এলাকার আরব বাণিজ্য শৃঙ্খলার সঙ্গে জুড়ে গেল।' [*টাকাকড়ি সংখ্যা-পরম পত্রিকা*] এই পর্বে মূলত দুটি বিষয় খেয়াল করবার আছে।

প্রথমত, ভাস্কোর ভারত 'আবিষ্কারের' কত কাল আগে থেকে দক্ষিণ এশিয়া [দক্ষিণ চিন সংলগ্ন], আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রধানত কড়ির মাধ্যমে

বাণিজ্য, দৈনন্দিন খুচরা কারবার চলছে তার আন্দাজ নাই। ফলত দক্ষিণ এশিয়ায় তুর্কি শাসনের আগে রূপোর টাঁকশাল দু'একটি জায়গা ছাড়া সেভাবে গড়েই ওঠেনি - যে কালে কড়িই ছিল ধনসম্পত্তির প্রতীক, যাকে সঞ্চয় ও রক্ষার জন্য রাজা ও বণিকেরা দালানবাড়ি বানাতেন, বাঙালি বণিকেরা মালদ্বীপ থেকে বিপুল কড়ি জাহাজে করে নিয়ে ফিরতেন; এমনকি গুজরাটী বণিকরা মালদ্বীপে গিয়ে বসতি পর্যন্ত স্থাপন করেন। ভাস্কোর ভারত আগমনের পর ইওরোপে কড়ির চাহিদা বিপুল বেড়ে যায়। কারণ এতদিন মধ্য এশিয়ার রেশম পথ [চীনারা যার আদলে 'বেল্ট আন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' প্রকল্পের 'আধুনিক' দাবিদার হয়েছেন] দিয়ে হরেক রকমের পণ্য যেমন রেশম, পাট, মশলা, বস্ত্র তারা যে বিশাল উর্বর অঞ্চল থেকে সস্তায় পেতেন তার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করা গেছে। যে ইওরোপিয় বণিকেরা এতদিন পশমের বদলে পাওয়া রূপো দিয়ে প্রধানত বাণিজ্য করতেন, দক্ষিণ এশিয়ার বিপুল বাজার থেকে লেনদেন করতে গেলে তার প্রচুর কড়ি লাগবে, কারণ রূপো এখানে শখ, উপহারের বস্তু, কোটি কোটি স্বাধীন উৎপাদক ও বিক্রেতার বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম নয়। যথারীতি আগামী ৫০ বছরের মধ্যেই ইওরোপিয় বণিকেরা মালদ্বীপে একচেটিয়া [বাণিজ্যবাদ] কড়ি ব্যবসার জন্য দস্যুতা শুরু করবে। প্রায় ত্রিশ বছর মালদ্বীপে কড়ি ব্যবসা দখলেও রাখবে।

আর দ্বিতীয়ত, তুর্কি শাসনামলে গোড়াপত্তন হওয়া টাঁকশালের রূপো মুঘল আমলে বিশ্ব বাণিজ্য বিশাল প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে বিশাল ধনসম্পদ [অর্থাৎ মোহর আর রূপোর টাকা] বাঙলা তথা দক্ষিণ এশিয়ায় জমতে শুরু করে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পলাশী বিজয় এই বিপুল ধনসম্পদ [অর্থাৎ সোনা, রূপো] লুঠ করে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় কড়ির অর্থনীতি ধীরে ধীরে ধ্বংস ক'রে রূপোর মুদ্রা 'টাকা'[টংকা]-কে একচ্ছত্র মুদ্রা হিশাবে প্রতিষ্ঠা করে, যা বস্তুত চাহিদা, যোগান ও বাণিজ্যের অন্যান্য শর্তগুলিকে উপনিবেশিক দখলদারদের হাতে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ভরশীল করবার মাধ্যমে এক 'বৈধ' লুঠের অর্থনীতি স্থাপন করে।

আজ যখন হাট সম্পর্কে জানতে আসছি, তখন কড়ি বাঙলা প্রবাদ আর মধ্যযুগের সাহিত্য ছাড়া নিশ্চিহ্ন। টাকা স্থানীয় খুচরা অর্থনীতি মাধ্যম; এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রধান মুদ্রামাধ্যম ডলার থাকবে কি না কী হবে সেই নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এই কারণেই আজকের গ্রামবাঙলার হাটে এমনকি কর্পোরেট পণ্যের উপস্থিতি আমাদের অন্যতম প্রধান আলোচ্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ প্রবাহ কেন্দ্র হিশাবে হাট কোন ঐতিহাসিক পরম্পরার অংশ, তা চেনা যায় কড়ির ইতিহাস থেকে। বলা বাহুল্য, যদাপি হাট বা অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন বন্টনের এই শৃঙ্খলা ধনতান্ত্রিক সমাজ ছাড়াও দাস সমাজ ও ভূমিদাস সমাজেও সংখ্যাগুরু জনতাকে সংকট থেকে বাঁচিয়ে রাখত [মার্ক্স], তদাপি আমরা শুধু একে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শপিং মল সুপার মার্কেট, রিটেল সেন্টারভিত্তিক 'বৈধ' লুঠেরা বিনিময় থেকেই আলাদা করছি না, আলাদা করছি ইওরোপিয় দাস ব্যবস্থা ও ভূমিদাস ব্যবস্থার কেন্দ্রীভূত উৎপাদন, বিনিময় পদ্ধতির

ইতিহাস থেকেও। প্রাকধনতান্ত্রিক যুগে জ্ঞান পৃথিবীর সব এলাকাতেই মুক্ত ছিল, এই কথা জানবার সাথে সাথে আমাদের এটাও সতর্ক থাকা দরকার, যে প্রকার সৃষ্টি স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণের বাইরে অর্থাৎ যে উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণ, অধিকার-বহির্ভূত; তার জ্ঞান ও জ্ঞানের বিকাশপ্রবাহ যথার্থ অর্থেই অনুৎপাদক নিয়ন্ত্রক দাস মালিক বা সামন্ত প্রভুর ইচ্ছাধীন; অর্থাৎ কী প্রকার উপকরণ বা প্রযুক্তি আবিষ্কার হবে তা নির্ভর করবে শোষকের স্বার্থের উপর।

এই সমস্ত কারণেই হাটের অর্থনীতি ও পরম্পরা আলোচনার ঝুঁকিপূর্ণ কাজটির সাফল্য নির্ভর করছে সম্পদ, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের মুক্ত প্রবাহ এবং বৈষম্যরোধক সাম্যাবস্থা বজায় রাখবার ঐতিহাসিক শর্তগুলিকে চিহ্নিত করবার মধ্যে। আমরা তাই এই পর্বে প্রবাহকেন্দ্র হিশাবে হাটের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে বারবার ইতিহাসের আশ্রয় নিচ্ছি।

ক। উৎপাদকদের বিনিময় ক্ষেত্র
খ। স্বাধীন বিক্রেতার বিনিময় ক্ষেত্র, যে উৎপাদকের উপর এবং উৎপাদক যার উপর নির্ভরশীল
গ। অপরের সঙ্গে পরিচয়

ক। কোনো একটি পণ্য ধরা যাক নুন, প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের কিনারায় এই পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানি একযোগে কয়েক হাজার উৎপাদকের শ্রম কেন্দ্রীভূত কারখানায় শোষণ করে সারা জেলার প্রতিটি 'রিটেল সেন্টার' কিম্বা খুচরা দোকানে পাঠিয়ে দেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অর্থাৎ কারখানায় মোট কত পণ্য তৈরি হচ্ছে, কত কাঁচামাল লাগছে, কত মূলধন ব্যয়িত হচ্ছে, বাজারে সেই পণ্য কীভাবে যাচ্ছে, কোথাকার বাজারে কত দামে সেটি বিক্রি হচ্ছে এবং কারা এর ভোক্তা হচ্ছেন; এইসবের কোনো জ্ঞান বা এইসব সিদ্ধান্তে কোনোরূপ অধিকার, নিয়ন্ত্রণ উৎপাদকদের নাই। এমনকি উক্ত পণ্যের গুণ, যা নির্ধারিত হয় [কাঁচামাল, উপকরণ ছাড়াও] মূলত দক্ষ শ্রমপ্রক্রিয়ার দ্বারা, সেই শ্রমপ্রক্রিয়ার উপরেও এমনকি শ্রমিকের বা উৎপাদকের থাকে না কোনো বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ। এইরূপ পণ্য উৎপাদনের উপকরণ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদকের শ্রমপ্রক্রিয়াকেও সর্বাত্মক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। স্রষ্টার হাত থেকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া ছিনিয়ে নিয়ে কোনো শয়তানই এমন কাজ করতে পারে যার প্রভাবে সম্পদের একচ্ছত্র কেন্দ্রীভবন ঘটে, অর্থনীতি সমাজজীবন ভারসাম্য হারায়, অধিকাংশ জনতা বেকার ও ক্রয়ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে, বৈষম্য আকাশ ছোঁয়। অন্যদিকে এর ফল হিসাবে পণ্যের গুণ ও বৈচিত্র্য খতম হয়ে যায়। একইসাথে ভোক্তা সুরক্ষাকে আইনি ঠেকা বানিয়ে জনতাকে বিষ খাইয়ে মূর্খ বানানো চলে। আর আমরা বুঝতে শিখি পৃথিবীর সব নুন একইরকম

শাদা, ঝুরঝুরে টাটাজাত হয়।

কথা হল, এই পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতিই যেমন 'রিসার্চ আণ্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর নামে লাখ টাকা খাটিয়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারে থাকা সকল নুন উৎপাদনকে অস্বাস্থ্যকর, বেআইনি ও কালো ব্যবসা প্রমাণিত করে; তেমনি ঠিক এর বিপরীতে হাট হল প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের বিনিময় বা মিলনক্ষেত্র যেখানে থাকা পণ্য মূলত স্থানীয় উৎপাদকের তৈরি স্থানীয় ভোক্তার সুরক্ষাস্বার্থকে সর্বে অগ্রাধিকার দেয়। এক ছুতোর বুকে হাত রেখে বলতে পারেন, "আমি যদি পেরেক বসিয়েও চেয়ার বানাই, এমন করেই বানাব যাতে আসনগ্রহণকারীর কোনো ক্ষতি না হয়, তিনি আরাম পান।"

এই বাধ্যতা কোম্পানির থাকে না, কারণ সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই। ক্রেতার এমন সুযোগ সামর্থ্যও নাই যেখানে কোম্পানি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। বরং এমন ঘটনা ঘটলে তা বিচার করবার জন্য আছে আইন ও আদালত, যার সঙ্গে ক্রেতা বা ভোক্তার তুলনায় কোম্পানির সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ঠিক একই বাধ্যতা আইন ও আদালত নিরপেক্ষ অনিয়ন্ত্রিত হাটে থাকছে কীভাবে? কারণ প্রথমত এটি প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের বিনিময় ক্ষেত্র যার প্রধান ভোক্তা হচ্ছেন উৎপাদকেরই স্থানীয় অধিবাসীরা, যারাও পারতপক্ষে কোনো না কোনোপ্রকার সামাজিক উৎপাদনের অংশীদার। এই প্রকারে হাটে আসা সকল বিক্রেতা সকল ক্রেতার উপর, আর সকল ক্রেতা সকল বিক্রেতার উপর পরস্পর নির্ভরশীল। এই স্থানীয় নির্ভরশীলতার চরিত্র দেখিয়েই যুদ্ধবাজ দখলদাররা মূলত দুটি জিনিস প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন; এক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা হিশাবে এটি কত দুর্বল, আর দুই, স্থানীয় পণ্য মানেই গুণগত ভাবে নিকৃষ্ট। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পর্বে বিশদে লিখব, শুধু একটা উদাহরণ না টেনে পারছি না, তা হল মদের। আজকাল কোম্পানিজাত মদ ছাড়া অন্য যেকোনোপ্রকার মদকেই বেআইনি, বিষের পর্যায়ে ফেলা হয়, মোটামুটি সকলের [মূলত 'নাগরিকদের'] আস্থা কাঁধে নিয়ে রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনীগুলি স্থানীয় হাঁড়িয়া, মহুয়া, সুরার প্রস্তুতকেন্দ্রগুলি সগর্বে [হয়ত বিলাতি খেয়েই] ভাঙচুর করে বেড়ান। এমনকি দেশি বিদেশি কোম্পানিজাত মদের বাজার সুরক্ষিত রাখতে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে স্থানীয় মদে বিষ মিশিয়ে শয়ে শয়ে লোকের মৃত্যুকে অর্থনৈতিক ভাবে ব্যবহার করেন। বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্রশিল্পী সংঘের মুখপত্র 'পরম' পত্রিকার '*সুবে বাঙলার সোরা সংখ্যা*' ইতিহাস-ঘোরানো কাজ করে দেখিয়েছে কীভাবে বাঙলার সোরা লুট করে ইওরোপে 'সমরশিল্পে' বিপ্লব ঘটানো হয়েছে।

এই পর্বে উত্তরবঙ্গের সম্ভবত সবচেয়ে বড় হাট ধনখৈল হাটের উদাহরণ টানব। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দিনাজপুর রাজবংশের রাজা রামনাথের আমলে এই হাটের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল ধান ও খৈল

[তৈলবীজের অংশবিশেষ], তাই নাম হয় ধনখৈল। পুনর্ভবা নদীসংলগ্ন এলাকায় এই হাটের প্রতিষ্ঠা একে নৌবাণিজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেয়, যাকে এককালে বলা হত দিনাজপুরের 'শস্যভাণ্ডার'। ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে এখানে প্রতি হাটবারে ন্যূনতম ৫০০টির বেশি ঢেঁকিতে ধান ঝাড়াই চলত। পত্তনকালে এই হাটের কর আদায় ও পরিকাঠামো দেখভালের দায়দায়িত্ব ছিল ঘুঘুডাঙ্গার জমিদার ফুল মোহম্মদ চৌধুরীর উপর। 'কালের নৃশংস নিয়মে' এটি ব্রিটিশদের হস্তগত হয়, ব্রিটিশরা হস্তান্তর করেন তাঁদের বসিয়ে যাওয়া দেশি সাকরেদ ইওরোপনির্ভর দিল্লীকেন্দ্রিক আমলাতন্ত্রের হাতে। এটি আলাদা করে উল্লেখ করছি কারণ এই হাটের লক্ষ লক্ষ কৃষক কারিগররাই তেভাগা আন্দোলনে নিজেদের জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছিলেন সেইসব দেশি অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে যারা ব্রিটিশদের ছিটানো খই খেয়ে বাঙলার কৃষিকেন্দ্রিক কারিগরিকে ধ্বংস করার স্থানীয় অস্ত্র বনেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি এই হাট এলাকাসংলগ্ন খানপুরেই পুলিশের গুলিতে ২১ জন কৃষক প্রাণ হারান; ধনখৈল হাটে তাঁদের স্মৃতি সৌধাকারে সংরক্ষিত আছে। এমনকি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বহুধা ধর্মঘট ও সমাবেশে এই হাটের কারিগর ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণের ইতিহাস আছে যা অবিভক্ত বাঙলার ইতিহাস বলেই আমরা স্বীকার করি।

আসি ধনখৈল হাটের কারবার প্রসঙ্গে। উত্তরবঙ্গের [সম্ভবত] বৃহত্তম এই হাট সপ্তাহে দুই দিন, সোমবার বড় হাট ও বৃহস্পতি বারে ছোট হাট বসে। বড় হাটের দিন সারা বাঙলাদেশ, নেপাল, ভূটান, আরব, মালয়, সিঙ্গাপুর ও ভারতের অন্যান্য করদরাজ্য থেকে এখানে ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করতে আসেন। প্রতি সোমবারে বড় হাটে আনুমানিক ৩০,০০০ বিক্রেতা ও ১,০০,০০০ ক্রেতার সমাগমে এই হাট এক সাপ্তাহিক উৎসবে পরিণত হয়, যেখানে ক্রেতাদের দৈনিক ব্যবসা ২০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং আয় যথাক্রমে ৬০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত অনুমান করা যেতে পারে। অতয়েব দিনে মোট ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ৪৮ কোটি টাকা! হিশাবে দেখা যাচ্ছে ক্রেতাদের গড় খরচ ৪৮০ টাকা ও বিক্রেতাদের গড় আয় ১৬,০০০ টাকা। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারে প্রায় ৫০০০ বিক্রেতা ও ২০,০০০ ক্রেতা সহযোগে এই হাটে ব্যবসা হয় মোট আনুমানিক ৫ কোটি টাকার!

আমি আর চিত্রগ্রাহক সৃঞ্জয় রায় তো সেইদিন ধনখৈল হাটে ঢোকামাত্রই হারিয়ে গিয়েছিলাম। এত বিশাল হাট আমরা দেখি নি কখনো। হাটের মূল প্রাঙ্গণে ঢুকবার আগেই রাস্তার দুই পাশে সারি সারি বিক্রেতা আসন ছিটিয়ে বসে আছেন। কতগুলি প্রবেশ পথ আন্দাজের বাইরে। কেউ কেউ বলছেন তিন চার মাইল দীর্ঘ এলাকাজুড়ে বিক্রেতারা আছেন হাট উপলক্ষ্যে। আমি বিস্মিত হয়ে হাজার হাজার মানুষের কোলাহলে হাঁটছিলাম আর দেখছিলাম পণ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য সম্ভার। এমন কোনো

প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া মুশকিল যা এই হাটে নেই। হঠাৎ আটকে যাই, এক চৌদ্দ বয়সের উচ্ছ্বল কিশোর এক গ্লাসভর্ত্তি সুপেয় শরবৎ আমার হাতে দিয়ে বলে 'দাদা, আমাদের বীরপুরে বাড়ি, হাটের দিন সবাই মিলে তৃষ্ণার্ত মানুষদের জন্য শরবতের আয়োজন করেছি।' আমি ওদের সবার সঙ্গে পরিচয় করছি এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী হলে সৃঞ্জয় রায় শরবৎ পান করতে এগিয়ে এলেন। গলা মাথা ঠাণ্ডা করে আমি কল্পনা করতে লাগলাম একটা সহজ তুল্যমূল্য। এখানে এই ধনখৈল হাটের বদলে যদি একটা স্থায়ী শপিং মল থাকে। যেখানে সাপ্তাহিক ভাবে গড়ে ১০০,০০০ ক্রেতা যায়, মোট সাপ্তাহিক ব্যবসা হয় ৪৮ কোটি টাকার। সেক্ষেত্রে ক্রেতাদের গড় দৈনিক খরচ ৩০% [গড় কর্পোরেট মূল্য সংযোজন] বাড়লে দাঁড়ায় ৫৫০ টাকা আনুমানিক। অর্থাৎ সপ্তায় প্রায় ৩৫০০ টাকা। তাহলে ১০টি কোম্পানির বড়জোর ২,০০০ জন সেই মুনাফার ভাগ পাবে, উৎপাদকরা পাবেন শুধু শ্রমশক্তির মূল্য। পরিকাঠামো কর্মীরাও পাবেন শ্রমশক্তির মূল্য। মোট ২১ কোটি মুনাফা হলে আমলা ও আধিকারিকরা সাপ্তাহিক গচ্ছিত করবেন গড়ে প্রায় ১ লক্ষ টাকা করে। কর্মী ও উৎপাদকরা সংখ্যায় যদি ১০,০০০ লোকও ধরি [কারখানার শ্রমিক, কর্মচারী সব মিলিয়ে] তা হলে তাঁরা সপ্তায় গড়ে পাবেন ২০০০ টাকা করে। ১৬,০০০ লোক কর্মচ্যুত হল। যাঁদের সাপ্তাহিক বেতন ২,০০০ টাকা তাঁরা কি আর সপ্তাহে ৩৫০০ টাকা ব্যয় করতে পারবেন? তাঁরা তাই জিনিস কেনেন বাইরে থেকে বা হাট থেকে উচ্ছেদ হওয়া রাস্তায় বসা স্বাধীন ব্যবসায়ীর থেকেই কিম্বা তা-ও না পারলে অভাব, দারিদ্র্যে মূর্চ্ছা যাবেন। অতয়েব অতিউৎপাদন বলে একদিকে পণ্য নষ্ট হবে, অন্যদিকে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিপুল ক্রেতা তা কিনতে পারবেন না, কারণ একদিকে পণ্যের দাম বেড়েছে অন্যদিকে কাজ চলে গেছে। এইভাবে কৃত্রিম সংকট নির্মাণ, চাহিদা নির্মাণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে এবং মুনাফার স্বার্থে/আচারে সংখ্যাগুরু জনতাকে ক্রমশ অটোমেশনে কর্মসংকোচনের দরুণ আরো দেউল ও নিঃস্ব, লুম্পেন করে তুলবে তারপর হরেক রকম অদরকারি, ক্ষতিকারক ক্ষেত্রকে লাভজনক মুনাফার ক্ষেত্র হিসাবে কৃত্রিম ভাবে নির্মাণ করা চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন, যোগানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করার রাস্তা দেবে নতুন প্রজন্মকে। মানুষকে অমানুষ বানাবার ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের লুঠেরা অর্থনীতি বিকাশ লাভ করবে। বৈষম্য, দারিদ্র্য আনবে। এই স্বাধীন উৎপাদক বিক্রেতাদের কেউ ধনতান্ত্রিক হয় নি, হয়েছে ইওরোপিয় শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি যুদ্ধবাজ বণিকরা, এদের সম্পদ, জ্ঞান লুঠ করে। এখানকার বণিকরা যখন অন্য দেশে বাণিজ্য করছেন, কেউই সেই অঞ্চল দখল করে সেখানে স্থায়ী লুঠের বন্দোবস্ত করার জন্য কিম্বা সেখানকার চাহিদা যোগান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন না। বরং এখানকার ব্যবসায়ীরা সাধারণ ভাবে অন্য যে এলাকায় নিজ এলাকার উদ্বৃত্ত দ্রব্য নিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছেন সেই অঞ্চল ও তার মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় ও বিনিময়ের মাধ্যমে আদতে এক সচেতন বা অবচেতন আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখছেন পরস্পরের গুরুত্ব বুঝে। হাট হল এই আন্তর্জাতিকতাবাদী মুক্ত প্রবাহের মৌলিকতম একক;

একইসাথে মূলগত ভাবে স্বাধীন উৎপাদকদের এমন বিচলনক্ষেত্র, স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করবার সাথে সাথে যা আন্তর্জাতিক ভাবে সম্পদ বন্টনে বৈষম্যকে রোধ করবার ও সাম্যাবস্থা বজায় রাখবার শ্রেষ্ঠতম বিনিময়ক্ষেত্র।

খ। হাট শুধু উৎপাদকেরই জায়গা নয়, আমরা যাঁদের বণিক বা ব্যবসায়ী বলে চিনি তাঁদেরও প্রধান জায়গা। সমস্যা হল বণিক বা ব্যবসায়ী বলতেই আমাদের মনে যে যুদ্ধবাজ নাবিক কিম্বা বিশ্বাসঘাতক লুঠেরার ছবি মাথায় আসে, তার সঙ্গে হাটে আসা বণিক বা ব্যবসায়ীর কোনো মিল নাই। ব্যবসায়ীরা নিজ অঞ্চলের উদ্বৃত্ত দ্রব্য পণ্য হিশাবে ভিনদেশে, অর্থাৎ আনুমানিক ১০০ কিলোমিটার আয়তন অঞ্চলের বাইরের দেশে [বিশ্বেন্দু নন্দ এই আয়তনকেই স্থানীয় উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের অর্থনীতির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা বলেছেন, যার বাইরের দেশই সেই এলাকার কাছে বাণিজ্যিক অর্থে বিদেশ] নিয়ে যান ও সেই অঞ্চলের উদ্বৃত্ত পণ্য নিজ দেশের জন্য নিয়ে আসেন; এই কাজ বিভিন্ন সমাজের মধ্যে জ্ঞানের, প্রযুক্তির পবিত্র প্রবাহ হওয়ায় এটিকে এখানকার সাহিত্যে পূজ্য দেখা গেছে।

হাটের অর্থনীতিকে আজ রাজনৈতিক অর্থে নতুন ভাবে বোঝার প্রয়োজনে এই প্রবাহ ব্যবস্থাটিকে আরো নিবিড়ে দেখা দরকার। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ *'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত'* নিবন্ধে প্রাক-পুঁজি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে ইওরোপিয় বণিক শ্রেণির দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন ইংলন্ডের বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলনের নেতা ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রস্তাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকল্পনাটি মূলগতভাবে একচেটিয়া বাণিজ্যবাদ বিরোধী - অবাধ বাণিজ্যবাদের পক্ষপাতী বণিকদের উন্নয়নকামী আধুনিকতার প্রকল্প, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অবাধ বাণিজ্যবাদী বণিকরা পার্লামেন্টের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে একচেটিয়া বাণিজ্যবাদী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অপশাসনকে নিজেদের সুশাসনের হস্তগত করে যা ভারতবর্ষে 'স্বাধীন' পুঁজির বিকাশে প্রকল্পিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বদমায়েশ আমলা ও নতুন শয়তান জমিদার শ্রেণির হাতে যা স্থায়ী শোষণের নৃশংস নিপীড়নকারী ব্যবস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত হল; যার ফল হল এই দেশে অভূতপূর্ব বৈষম্য, দারিদ্র্য। আমার সন্দেহ প্রকৃতই উদ্দেশ্যমূলক। আদিতে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, আজিকে আব্দুল কাফি, অধ্যাপকরা যখন ইঙ্গিত করেন জীবনানন্দ দাশের কবিতার সিংহভাগ বিষাদ আদতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পৃষ্ট রূপসী বাঙলার স্পন্দনধ্বনি, তখন যে অর্ধেক অবিভক্ত বঙ্গভূমি ব্রিটিশপূর্ব সময়ে নিষ্কর, রাজস্বমুক্ত ছিল, তার মোট ৭০ লক্ষ একর যৌথ চাষের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হবার পটভূমিকায় – ১৭৯৩ সালের আগে কর্নওয়ালিশের তেমনতর ব্যক্তি সম্পত্তি ভিত্তিক 'গণতান্ত্রিক' শাসন কায়েমের ব্যবস্থাপনার দিকে চোখ আমার এমনিই চলে যায়। আমরা সকলে বিস্মিত হয়ে দেখি বাঙলাদেশে এই প্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যা আইন করে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ধ্বংস করে ফেলছে; বিপ্লববাদের

মোহে পড়ে ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ যেটি সচেতন ভাবেই এড়িয়ে গেছেন বলে ধরে নেব কারণ বুর্জোয়া বিপ্লববাদের সঙ্গে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেয়ার কোনো যোগ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। আমাদের সমস্ত জট কেটে যায় এবং আমরা আরো বিস্মিত হই যখন আমরা দেখি কোনো পূর্বতন সামন্ত ভূস্বামীর জমি নয় বরং যৌথ সামাজিক জমি দখলকেই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত হিশাবে স্মিথ থেকে মার্ক্স সকলেই স্বীকার করেন, এবং এই প্রকারে ইওরোপে এনক্লোজার আইন এবং বাঙলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে গণহত্যায় হোক দখলদারিতে হোক লুণ্ঠনে হোক কিম্বা 'অবাধ' লুণ্ঠনের কারবারকে আইন বানিয়ে স্থানীয় স্বাধীন উৎপাদকদের সহযোগিতামূলক শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা ধ্বংস করে মজুরি দাসত্বের মাধ্যমে 'নতুন ধরনের সামন্ততান্ত্রিক' অর্থনীতি তৈরি করবার উপনিবেশিক স্বার্থে কোনো ফারাক দেখতে পাই না। এই 'নতুন ধরনের সামন্ততন্ত্র' যাকে মার্ক্স এনক্লোজারের ফলাফল হিশাবে ইংলন্ডে দেখছেন, রণজিৎ গুহ কিম্বা বিনয় ঘোষ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল হিশাবে বাঙলাদেশে দেখছেন, তা-ই আদতে আধুনিক জাতিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি। এই প্রশ্ন আজ আর জটিল নয় যে ঠিক যে প্রক্রিয়ায় পুঁজি তার ঐতিহাসিক বাধা ধর্মকে শাসন ও শোষণব্যবস্থার কায়দা বানিয়ে জাতীয়তাবাদী আধুনিক সমাজ 'জাতি' গঠন করছে, সেই প্রকারেই শোষণমূলক সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের একরকম নবায়িত সম্পর্ক হিশাবে মজুরি দাসত্ব - আদতে ভূমি দাসত্বেরই নতুন সংস্করণ হিশাবে প্রকট হয়েছে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তনের ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক শর্ত হিশাবে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদরূপী এতাবধি পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী সফলতম রাষ্ট্রীয় মতাদর্শটিকে সমাজতান্ত্রিকেরা আজ অবধি যুঝে উঠতে পারেন নি তার প্রধান কারণ ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক লুঠেরা কেন্দ্রীভূত শ্রমবিভাজন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা হিশাবে এটিকে পরস্পর নির্ভরশীল শোষণনিরপেক্ষ শ্রমবিভাজন ব্যবস্থায় থাকা উৎপাদকের ধর্ম থেকে ইতিহাসে তাঁরা আলাদা করে কখনোই বিচার করেন নি। এর ফল হিশাবেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা যে সমস্ত সামাজিক শ্রমপ্রক্রিয়ার উপায় উপকরণগুলিকেও দখল ও শোষণ করতে উদ্যত হয়, তাকে প্রগতি আখ্যা দিয়ে 'টেকনো ফিউডালিজম' নামক একই মদের নতুন বোতল তাঁরা আবিষ্কার করেন। তাঁরা আলাদা করতে পারেন না শোষণমূলক ঐতিহাসিক শ্রমবিভাজন ব্যবস্থার সেই মতাদর্শকে যা শ্রমপ্রক্রিয়াকেই নিরন্তর লঘু ও গায়েব করে আদতে অলস, পরজীবী, স্বার্থপর, প্রতিযোগী আজ্ঞাবহ যন্ত্রমানব হওয়াকেই মানুষের একমাত্র উন্নতি হিশাবে প্রতিপন্ন করতে চায় শুধুমাত্র লুঠের উদ্দেশ্যে। যাঁদের সৃষ্টির নামই কৃষ্টি - সেই সব সভ্যতার স্বাধীন উৎপাদকদের শ্রমপ্রক্রিয়ার সৃষ্টিশীল চরিত্র অনুধাবন করবার যোগ্যতা নাই বলেই এরা সেই শ্রমপ্রক্রিয়াকে শোষণমূলক শ্রমবিভাজনের দাসত্বমূলক শ্রমপ্রক্রিয়ার থেকেও ইতিহাসে আলাদা করতে পারেন না এবং যারপরনাই 'সামাজিক উৎপাদন' 'সাংস্কৃতিক উৎপাদন' তাঁদের কাছে তত্ত্বে, বাস্তবে বিপরীতধর্মী ভিন্ন প্রক্রিয়া হিশাবে গণ্য হয়। তদুপরি জাতিবাদী রাষ্ট্রের ভুয়া কল্যাণকারি প্রগতির হতাশাজনক শিকার

বনে 'দেশি' 'স্বাধীন' পুঁজি বিকাশের ওকালতি করেন, ভুলে যান যেকোনো দেশেই পুঁজি, গাঠনিক ভাবেই লুঠ ও দখলজাত উপায় উপকরণের কেন্দ্রীভূত এক নতুন শোষণের সম্পর্ক মাত্র, যা এতাবধি পৃথিবীর বৈষম্যকে আজ পয়লা নম্বরে তুলে প্রতিবছর গুণিতক হারে তাকে বাড়িয়ে চলেছে।

প্রবাহকেন্দ্র হিশাবে হাটের আলোচনায় এইসব উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য হল এটা প্রমাণ করা যে ফরহাদ মজহারের কথামতোই শ্রম যেমন হাড় ভাঙবার বিপরীতে এবাদতের সামিল হতে পারে, কিম্বা লক্ষ্য হাসিলে প্রকল্পিত সাধনার প্রক্রিয়া হতে পারে, ব্যবসা বাণিজ্যও তেমনি ঐতিহাসিক ভাবে ঘাড় ভাঙবার বিপরীতে প্রকৃতই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পবিত্র মাধ্যম হতে পারে। হাটে আমরা দেখি তেমনই এক বন্টন ব্যব্যস্থা যা সম্পদের ভারসাম্য বজায় রাখে। তাই রণজিৎ গুহ কথিত যে অবাধ বাণিজ্য একচেটিয়া বাণিজ্যবাদকে বেআইনি ঘোষণা করতে চায়, তাকে আমরা একচেটিয়া বাণিজ্যবাদেরই 'বিকাশ' বা 'প্রগতি' প্রমাণ ক'রে একে হাটনির্ভর প্রকৃত অবাধ বিশ্ববাণিজ্যের থেকে ইতিহাসে পৃথক ঘোষণা করতে চাই। কোনো উজবুক প্রশ্ন করলে, সেই প্রামাণ্য ঘাঁটা যেতে পারে যেখানে আইনি একচেটিয়া বাণিজ্যের যুগ ও অবাধ বাণিজ্যের যুগে বৈষম্যের প্রবৃদ্ধি দেখানো আছে। আপাতত আমাদের আলোচ্য আরো অনেক জরুরি কিছু আছে।

এই হাটনির্ভর অবাধ বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার কোনোরূপ অন্তর্বিরোধেই ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থা জন্মাবার শর্ত প্রস্তুত ছিল না - এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিম্বা এই প্রকার ব্যবস্থাপনায় শোষণের অবকাশ নাই এমন প্রমাণ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং হাটের প্রবাহ আলোচনায় যে কথা বলতেই হয়, তা হল: কোন কোন শর্তের জন্য বিশ্বের ধনাঢ্যতম উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের দেশগুলিতে পুঁজিবাদ সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত হল না বা সেইসব এলাকার বণিকেরা শিল্পবিপ্লব ঘটালেন না। সেইসব শর্তাবলী আলোচনার মধ্যেই এইসব দেশগুলির মতো বাঙলারও বণিকদের সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

ক্রীতদাস সমাজ, ভূমিদাস সমাজ থেকে মজুরিদাস সমাজ প্রতিষ্ঠা - এই সামাজিক বিকাশ আদতে অভ্যন্তরীণ বিরোধজাত। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তিসমূহ যেখানে অনুৎপাদক শাসকের হাতে শোষণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণাধীন, সেখানে শোষণের স্বার্থই একসময় সংকট, অস্থিরতা তৈরি করে; শোষিতরা আর 'একইভাবে' শোষিত হতে চান না, নতুন শোষনের উৎপাদন-সম্পর্ক হিশাবে ভূমিদাসতন্ত্র বা ধনতন্ত্র অধিষ্ঠিত হয়। প্রশ্ন হল, কোনো অঞ্চলে উৎপাদিকা শক্তিসমূহ অর্থাৎ প্রধানত উৎপাদনের উপকরণ ও শ্রমপ্রক্রিয়া যদি সরাসরি উৎপাদকের হাতে থাকে এবং সেইসব শক্তিসমূহ বলপূর্বক দখল করবার জন্য দস্যু বণিকদের সঙ্গে যদি রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী না থাকে, তা হলে

সেই অঞ্চলের বাণিজ্য নিজগুণে [অভ্যন্তরীণ] ক্রমান্বয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারে কি না। এতাবধি সমস্যাটির চর্চ্চা অন্তত মার্ক্সবাদী শিবিরে কোনো বিতর্কের অবকাশ রাখে নি। অথচ পুঁজি গঠিত হবার কোন কোন শর্ত এর মধ্যে উপস্থিত আছে, কোন কোন শর্ত নেই, কেন নেই, আদতে পুঁজির গঠন বলতে কী ধরণের 'গঠন' বা 'ধ্বংস' বোঝায়, সেই সমস্তের উত্তর বিশ্বের একদা ধনাঢ্যতম দেশ বাঙলার বণিকদের ইতিহাসেই হাজির আছে। যে বণিকেরা সম্পদের অঙ্কে এখনকার ধনকুবেরদেরও বেশি সম্পদের মালিক ছিলেন, যারা একদা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন কারবারে ঋণদানকারী ব্যাঙ্ক-স্বরূপ ছিলেন, উৎপাদনের প্রযুক্তি ও শ্রমপ্রক্রিয়ায় দখল ছিল না বলেই কিম্বা সেইসব অন্যায় জবরদখলের কাজে রাষ্ট্র শক্তি অর্থাৎ আইন, প্রশাসন বা সেনাবাহিনী এই বণিকদের কোনোপ্রকার দখলদারি,গণহত্যায় মদত দিত না বলে তাঁরা সেই সমস্ত গচ্ছিত বিপুল ধনসম্পদকে শোষণের আধুনিক সম্পর্ক পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে পারেন নি।

অর্থাৎ প্রযুক্তি ও শ্রমপ্রক্রিয়ার দখলই পুঁজি গঠিত হবার অভ্যন্তরীণ শর্ত হিশাবে কাজ করেছে, যার ফলে বিশ্বের দরিদ্রতম মহাদেশের বণিকেরাই প্রথম হেনতেন প্রকারেণ [যুদ্ধের মাধ্যমে] সারা বিশ্বের সম্পদ, জ্ঞান লুঠ করে নিজ দেশে 'শিল্প বিপ্লব' ঘটাতে পেরেছেন। উল্টোদিকে বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী এলাকার বণিকেরা বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যের মাধ্যমে বহুত সোনা রূপো সঞ্চয় করলেও স্থানীয় বিকেন্দ্রীভূত স্বাধীন উৎপাদকের প্রযুক্তি, শ্রমপ্রক্রিয়া দখল করবার কোনো এক্তিয়ার বা গায়ের জোর তার থাকে নি, এমনকি স্বদেশের রাজতন্ত্রও তাকে এমন পাপকাজে পরোয়ানা কিম্বা সশস্ত্র সহায়তা দেয় নি। ফলস্বরূপ রাজা, বণিক, বিদেশি শিল্পপতিদের ঋণদান, সোনা রূপোর সঞ্চয়ের বিলাসবাহুল্য, শখ ও উপঢৌকনের মধ্যেই তার গচ্ছিত অর্থের নৈতিক ভূমিকা সীমাবদ্ধ থেকেছে, একচেটিয়া বাণিজ্যবাদেও এমনকি পর্যবাসিত হয় নি; এবং এমনকি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের দ্বারা উৎপাদকদের সমৃদ্ধির কারণ হতে পেরেছে বলেই বণিকরা সামাজিক ভাবে কোথাও পূজ্যও থেকেছেন।

গ। এভাবেই বোধ হয় লেখা উচিৎ জীবনে যে'কয়বার শপিং মলে যাবার দুর্ভাগ্য হয়েছে, হতাশ নিরাশ ও পর্যায়ক্রমে সর্বস্বান্ত উদাস হয়ে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে নি। সারি সারি প্লাস্টিকে মোড়া পণ্য, দামদর করা তো দূর, অধিকাংশের গায়ে দাম লেখা নেই কিম্বা দাম জিজ্ঞাসা করবার কেউ নাই। যদিও হাঁকবাঁক করে দাম জিজ্ঞাসা করবার কাউকে পাওয়া যাচ্ছে, তার রাগী বিরক্তিপূর্ণ চোখের সামনে ক্রেতা হিশাবে অধোমর্ণ নিজের উপরেই বিরক্তি বেড়ে যাচ্ছে। পণ্য প্রচুর [পণ্য বৈচিত্রের তুলনায় ব্রান্ডের সংখ্যা ব্যাপক - অর্থাৎ একই পণ্য বিভিন্ন মোড়কে, আকারে, গন্ধে, বর্ণে আসছে - একেই পণ্য বৈচিত্র বলছে কর্পোরেট পুঁজি - বিশ্বেন্দু], বিক্রেতা মাত্র দু-তিনটি কোম্পানি, দেখভাল করবার জন্য অস্থায়ী চাকুরে নিয়োজিত আছে, যাদেরকে

বিনিময়কেন্দ্রটির মজুরি-শ্রমিক বলা যায়। অতঃপর একটার পর একটা পণ্য কিনে চলবেন, আপনার হিশাব হবে শেষে। হিশাবের জন্য যখন ঝুড়িটি কাউন্টারে এগিয়ে দেবেন, তার সঙ্গে এগিয়ে দিতে হবে ডিজিটাল লেনদেনের কার্ড। আপনার মোট কেনাকাটার দাম ততক্ষণে কার্ড থেকে কাটা হয়েগেছে, আপনি জানলেনই না কত টাকার কারবার হল।

এই প্রকার বিনিময় ব্যবস্থার আদর্শ পরিবেশ হল হিরন্ময় নিস্তব্ধতা। শপিং মলে ঢোকা, পণ্য ঝুড়িতে নেয়া, হিশাবের জন্য ঝুড়ি ঠেলে দেয়া, মুদ্রা বিনিময় করা এবং বেরিয়ে বাড়ি চলে আসা — পুরোটাই যত নিস্তব্ধ ভাবে ঘটবে, ততই তা এই প্রকার বিনিময় প্রথার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হবে অর্থাৎ স্মার্ট, মডার্ন বা সভ্য হবে। আপনি বাজার করতে গিয়েছিলেন ৫০০ টাকার, বেরিয়ে দেখলেন বাজার করেছেন ১৫০০ টাকার; এতে সংশ্লিষ্ট বিনিময় প্রথার বদলে আপনার নিজের লোভই আপনার কাছে প্রধান দায়ী হবে। কারণ কাঁচঘরে উত্থিত বৈষম্যের ঝলকানি আপনাকে দৃষ্টিহীন রেখে আপনার সম্মতিক্রমে আপনাকে দেউলে, ঋণগ্রস্ত, পাগল করে ছাড়বে।

এর ঠিক বিপরীতে হাট হল এমন বিনিময়কেন্দ্র যা চিৎকার চ্যাঁচামেচির আদর্শ জায়গা। এখানে কেউই চাকুরে নন, সকলেই নিজের সামাজিক ক্ষমতা ও অধিকারে হাটে মিলিত হয়েছেন। বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন স্থানের চাহিদা যোগানের ভারসাম্য অনুসারে দামদর উর্দ্ধগগনে চলছে। খোদ উৎপাদক, বিক্রেতারা টানা চেঁচিয়ে চলেছেন 'আলু দশ টাকা কিলো' 'আলু দশ টাকা', 'উচ্ছে আট টাকা' 'উচ্ছে আট টাকা' 'পটল পোঁরো টাকা' 'পটল পোঁরো টাকা'। শোনা যাচ্ছে ক্রেতাদেরও কণ্ঠ, "ঝিঙ্গা কত?' 'লাউ পাঁচ টাকা দিব', "লঙ্কা ঝাল তো?" ঘরে ভাঙা ছাতু, ময়দা, তুলো, পান, বাসনপত্র, ধর্মীয় উপাচার, সমস্ত রকমের শাক, সবজি, শস্যদানা, এমনকি চলন্ত ভ্রাম্যমান কামারশাল, লোহা ও ইস্পাতের নানাপ্রকারের দ্রব্য, গুড়, জিলিপি, হরেক রকম মিষ্টি, দুধজাত নানাপ্রকার দ্রব্য, মশলা, নানা শস্যের বীজ, গয়না, সজ্জা ও অলংকারের নানা রকম দ্রব্য, আরো নানারূপ খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, শিকড়বাকড়, ভেষজ ওষুধ, কাঠ ও মাটির নানা আসবাব ইত্যাদি বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন এলাকার মানুষ যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই খোদ উৎপাদক, তাঁরা বিক্রি করতে আসেন।

উদাহরণস্বরূপ পাথরপ্রতিমার জুমাই লস্করের হাটের কথা বলব। এই হাট আনুমানিক ১০০ বছর আগে জুমাই লস্কর নামে একজন সুন্দরবনের স্থানীয় নেত্রী প্রতিষ্ঠা করেন বলে এর নাম হয়েছে জুমাই লস্করের হাট। সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে

বাণিজ্য করতে নৌপথে আসা নানান পণ্যদ্রব্য ও ক্রেতাদের বড় এই মিলনস্থলে মেয়েদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই এই হাটের প্রতিষ্ঠা, যেখানে মেয়েদের বসবার মত জায়গা বা সুবিধাগুলি নির্দিষ্ট আছে। এই হাটের প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্য হল: শাক, সবজি, পান, ফলমূল, ইলিশ, চিংড়ি, কাঁকড়া, মধু, মাংস, মুদি, কাঠ, মাটির পাত্র, শোলা, নোনা ধান, কাপড়, জুতো ইত্যাদি বহুবিধ জিনিস। যখন নদীতে জোয়ার লাগে তখন পণ্যবোঝাই নৌকাগুলি ঘাটে ভিড় করে, আর যখন ভাটায় জল টেনে নিয়ে যায়, তখন বসে হাট। স্থানীয় এক বৃদ্ধের মতে এই হাটে আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগেও কড়ি দিয়ে ব্যবসা চলত, এমনকি ব্যবসা চলত ধানের বিনিময়েও।

তা এই হাট বর্তমানে বসে সোমবার আর বৃহস্পতিবারে। প্রায় তিন একর জমি জুড়ে। দৈনিক ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা আনুমানিক ১২,০০০ জন[ক্রেতা] থেকে ৫২০ জন [বিক্রেতা]। ৫২০ জন বিক্রেতার মধ্যে ২০০ জন বিক্রেতার দোকান স্থায়ী, আর বাকি ৩২০ জনের দোকান অস্থায়ী, যার আবার প্রায় ১০০টি দোকানের মাথায় ছাওনি রয়েছে। হাটে বসা অস্থায়ী আনুমানিক ৭৫ জন মহিলা এখানে হাট পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি সুবিধাগুলির দাবিদার, যথা ছাওনি, শৌচালয়, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাদি। আমাদের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বিক্রেতার আয় কারো ৩০০ টাকা থেকে কারো ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা। অতয়েব এই হাটে গড় দৈনিক কারবার চলে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার; যা মোটেই বারো হাজার ক্রেতাকে সর্বস্বান্ত করে একটা দুটা কোম্পানি নিজের পকেটে 'আইনি' ভাবে গচ্ছিত করতে পারে না; বদলে এই ২৫ লক্ষ টাকা বন্টিত হয় সুন্দরবনের ও আরো নানান স্থান থেকে আসা হাটদিনে প্রায় ৫০০/৬০০ বিক্রেতা ও প্রায় ৮০০-১২০০ উৎপাদকের মধ্যে, ক্রেতা যেখানে স্থানীয় চাহিদানুসারে ন্যায্য দামেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি কিনে নিয়ে যান। যেহেতু বিক্রেতা ৫০০-এর বেশি, একটা দুটা কোম্পানিমাত্র নয়, তাই প্রতিটি পণ্যদ্রব্য যা এই হাটে বিক্রি হচ্ছে সেগুলির প্রকার ভেদ, বৈচিত্র্যের কোনো শেষ থাকে না।

এই সংক্ষিপ্ত ভেদরেখা টেনে বোঝানোর চেষ্টা করলাম হাট কেন আসলেই মুক্ত মিলনক্ষেত্র। একটি ১০০ বর্গকিমি আয়তন অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন গ্রামে হাট যখন বসে, তখন সেখানেই সেই ১০০ বর্গকিমি অঞ্চলের মধ্যে থাকা বিভিন্ন গ্রামের মানুষ সাপ্তাহিক ভাবে মিলিত হন, তাঁদের নিজের নিজের গ্রামের উৎপাদিত নানান প্রকার দ্রব্যাদি নিয়ে। বৈদেশিকরা তাঁদের দ্রব্য নিয়ে আসেন, বিনিময়ে নিজ দেশের চাহিদামতোন দ্রব্য সংগ্রহ করে নিয়ে যান। আসল কথা হল বিনিময় কি শুধুমাত্র দ্রব্যাদিরই হয়? সেই সমস্ত দ্রব্যাদির মাধ্যমে আদতে বিনিময় সাধিত হয়

স্থানীয় জ্ঞানের। হাটে বাস্তবতই দেখা যায় হরেক রকম উপকরণের বিক্রি, যেগুলি ভিনদেশের বণিকেরা স্বদেশের উৎপাদনে নিয়োজিত করেন, যেমন বিভিন্ন এলাকার লোহাজাত দ্রব্য, এককালে আমরা দেখেছি বিভিন্ন এলাকার বয়ন প্রযুক্তির বিনিময়। জুমাই লস্করের হাট যেমন একদা বাঙলার বিভিন্ন প্রকারের সুতো ও তাঁত কাপড়ের বিনিময় কেন্দ্র ছিল। এছাড়াও ধর্মীয়, নান্দনিক উপাচার বিনিময়ের মাধ্যমে হাট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিচয়ক্ষেত্রও বটে, যেখানে বিভিন্ন মরশুমি মেলা, খেলা, উৎসবে এক স্থানের লোক অন্য স্থানের সঙ্গে মিলিত হন; খোদ জুমাই লস্করের হাটেই আমরা জানতে পারি প্রতি অগ্রহায়ণ মাসে নৌকা দৌড়, মাছ ধরা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, এমনকি প্রতিবার হাট শুরুর আগে হয় বনবিবির পূজা। এই পর্বে বলতেই হয়, হাটে ছড়িয়ে মেলে থাকা জ্ঞান কারো একচেটিয়া সম্পত্তি নয় বলেই তা সকলের সম্পদ, যা এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে চাহিদা অনুযায়ী প্রবাহিত হয়।

পর্ব দুই।।
বিনিময় নিরপেক্ষ কৃষ্টির [উৎপাদনের] উদ্বৃত্ত বিনিময়ক্ষেত্র

হাট নামক বিনিময় ক্ষেত্রটির অক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গেলে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের নিয়মকানুন চর্চ্চার প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডটি প্রথমেই বর্জন করে বলতে হয় এখানে অর্থশাস্ত্রের প্রতিটি অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন ধারণা অর্থাৎ বিতরণ, ভোগ ও এই দুইয়ের মাধ্যম হিশাবে 'বিনিময়' হাজির থাকলেও, হাট হচ্ছে মূলগত ভাবে একটি 'বিনিময় নিরপেক্ষ' সামাজিক উৎপাদন ও ভোগের বিতরণ শৃঙ্খলার বিনিময় ক্ষেত্র। অতএব হাটের শিরদাঁড়া এই প্রকার উৎপাদন পদ্ধতি পরিচয়ের আগে জেনে নেওয়া ভালো যে বিমূর্ত ধারণা হিশাবে 'অর্থনীতি' যেমন এই শ্রম বিভাগের সমাজে অন্য রূপ ও আকার, অর্থ পরিগ্রহ করে, তেমন ভাবেই একে নিছক 'অর্থনৈতিক উৎপাদন' নামক ক্যাটাগরিতে ফেলা স্রেফ বুর্জোয়া অকাদেমিক দোষ বলেও চিহ্নিত করা যায়। 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা'য় মার্ক্স লিখছেন, *"ঐতিহাসিক ভাবে অপরিণত হওয়া সত্ত্বেও খুবই বিকশিত সমাজের অস্তিত্ব রয়েছে, অর্থ ব্যবস্থার উচ্চতম পর্যায় — যেমন সহযোগিতা, উন্নত শ্রমবিভাগ, প্রভৃতি যে সমাজে লক্ষণীয়, অথচ যেখানে*

মুদ্রার প্রচলন অনুপস্থিত - পেরু হচ্ছে এ ধরণের সমাজের উদাহরণ, স্লাভ গোষ্ঠীও একটি। মুদ্রা ও বিনিময়ের নির্ধারক ভূমিকা থাকলেও প্রতিটি গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে মুদ্রা আর বিনিময়ের ভূমিকা খুবই গৌণ। মুদ্রার ভূমিকা কেবল সীমান্তে – অন্যদের সঙ্গে মাল আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে। [তাই] বিনিময়কে গোষ্ঠী সমাজের আদি অকৃত্রিম সাংগাঠনিক উপাদান হিসেবে গণ্য করে কৌম সমাজের অভ্যন্তরে একে স্থাপন করা নেহাতই একটা ভুল।" উপরন্তু হাট এমন উৎপাদনের বিতরণ কাঠামো মুদ্রাও যেখানে স্বাধীন উৎপাদকের সৃষ্টি। মুদ্রারূপী দ্রব্যের একচেটিয়া অধিকারলাভ হাটনির্ভর অবাধ বিতরণ ব্যবস্থাটিকে ভেঙে তার স্থানে প্রতিষ্ঠা করছে 'কর্পোরেট বাজার অর্থনীতি', যা প্রাথমিক ভাবে মুদ্রার মতোই উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে দখল ও কেন্দ্রীভূত করে সংগঠিত।

যে বিতরণ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র 'পণ্যের' বিনিময় সাধিত হয় না, বিনিময় সাধিত হয় জ্ঞানের, প্রযুক্তির, তা স্বভাবতই বিনিময়কারীদের মধ্যে কোনোরূপ অসম চুক্তি কিম্বা জুয়াচুরির বদলে প্রকৃতই স্থানীয় চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী সম্পাদিত একটি মুক্ত 'আন্তর্জাতিকতাবাদী' বিশ্বব্যবস্থা। [অর্থনৈতিক] শ্রমের যে প্রকার বিতরণ ব্যবস্থা এই মুক্ত আন্তর্জাতিকতাবাদী বিশ্বব্যবস্থার ধারক, সেটি মূলগত ভাবে সমাজতান্ত্রিক না হলে চলে না। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগ বা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ব্যতীত কোনোপ্রকার শোষণমূলক শ্রমবিভাজন এই ধরণের সাম্যবাদী বিতরণ ব্যবস্থা চালাতে পারে না। যারপরনাই আধুনিক অর্থশাস্ত্র, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রও এমনকি উৎপাদন পদ্ধতি আলোচনায় শ্রমবিভাজনের একটি একরোখা ইতিহাসই চর্চ্চা করে, যেখানে কেন্দ্রীভূত ভাবে অনুৎপাদক শোষক/শাসক শ্রেণি উৎপাদকদের শ্রমবিভাগ নিয়ন্ত্রণ শুধু করেনা উপরন্তু শোষণের উদ্দেশ্যেই শ্রমপ্রক্রিয়া ও উৎপাদন প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা হাট নামক বিশাল বিনিময়ক্ষেত্রটির এই 'বিনিময়-নিরপেক্ষ' সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকেই এখন রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ভাষায় বুঝবার প্রচেষ্টা করব।

আমি থাকি ফুলডাঙায়। বোলপুর শহরের কাছে। একদা আদিবাসী গ্রাম ছিল, এখন পৌরসভা অঞ্চল। আজ দুপুর বেলা শ্যামবাটি থেকে ঘরে ফেরার পথে পাড়ায় ঢুকেই দেখলাম একটা দশ বারো বছরের বালক একটি বড় তাল ফুটবলের মতন করে পায়ে লাথি মেরে রাস্তায় গড়িয়ে খেলতে খেলতে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। এখন শ্রাবণ মাস, এই দৃশ্য এমন কিছু অস্বাভাবিক না। এরপর হয়ত সে বাড়ি গিয়ে মা'কে হাঁক দিয়ে বলবে 'ও মা তাল এনেছি', আরো দুপুরে দেখা যাবে তার ছোট বোনও আর একটা তাল এনেছে, সেটা আরো বড়, পাশের পাড়ার কারো বাড়িতে অনেক তাল পড়েছে, সেখান থেকে সবচেয়ে বড় তালটি ওর বোন পেয়েছে। তা যাই হোক, মা হয়ত মাটি উনুনে জাল দিয়ে সন্ধ্যায় পায়েশ বানিয়ে দেবেন, সেই পায়েশ হয়ত পরিবারের

সকলে ধরা যাক আট দশ জন মিলে ভাগ করে খাবেন।

বোঝা যাক, আমরা আলোচনা করছি বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা, পৃথিবীর তিন ভাগ মানুষ যেখানে থাকেন সেই এশিয়ার বিশাল বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন পদ্ধতি বিষয়ে, যেখানে সব ঋতুই আসে, পৃথিবী নামক গোলকটির সবচেয়ে সবুজ 'সুজলা' 'সুফলা' এলাকা বঙ্গোপসাগরের উত্তরে এই বিশাল বাঙলার গ্রামে এই দশ বছরের বালকটি যে উৎপাদন করছে, সেই উৎপাদনের পদ্ধতি একান্তই তার, শ্রম প্রক্রিয়াটির যথাসম্ভব আনন্দ সে উপভোগ করে নিচ্ছে, এবং তা বাড়িতে গিয়ে আরো অনেকের একইরকম 'স্বাধীন', 'সৃষ্টিশীল' শ্রমপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো সার্বজনীন চরিত্রের যৌথ শ্রমপ্রক্রিয়ার ফসল হিশাবে একটা সুস্বাদু খাদ্য পায়েশ উৎপন্ন করছে। সেই উৎপন্নের ভোগ হবার আগে বিতরণের বিশেষ মুহূর্ত হিশাবে যদি কোনো 'বিনিময়' এখানে থাকে, তবে তা এই উৎপাদন কর্মটি সম্পাদিত হবার ক্ষেত্রে একটা সহজাত যৌথতার নীতিতে সকলের 'সার্বজনীন', 'সৃষ্টিশীল' ও 'যৌথ' শ্রমপ্রক্রিয়ার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটা সরল দৃষ্টান্ত মাত্র। কেন আমি এইসব কথা বলছি? কারণ সেই বালকটি, যে এখানে সমগ্রের একজন উৎপাদক, সে জানে না যে পদ্ধতিতে সে উৎপাদন করছে, অর্থাৎ জ্ঞান [কোথায় তাল পাওয়া যায়, কোনটা তালটা পাকা, কোনটা মিষ্টি, স্বাদ গন্ধের জ্ঞান ইত্যাদি], উৎপাদনের উপকরণ [তার হাত পা, এমনকি বাতাস যার ধাক্কায় তালটি মাটিতে পড়েছে], কাঁচামাল ['সম্পদে' তার যৌথ সহজাত অধিকার] : এই সবগুলিতে তার মালিকানা [OWNERSHIP] ও নিয়ন্ত্রণ আছে, এবং উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কে তার এরূপ স্বতন্ত্র্যতা তাকে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিম্বা বাজারে সচেতন 'বিনিময়ের' মাধ্যমে অর্থাৎ পয়সার 'বিনিময়ে' অর্জন করতে হয় নি। সেই উৎপাদক বালকটি জানে না এই উৎপাদন পদ্ধতিই আসলে প্রকৃত সাম্যবাদী, যেখানে উৎপাদকের স্বতন্ত্র্য ও সার্বজনীন মালিকানা আছে, যা কখনো উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে প্রকৃতই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; রাষ্ট্রকে অকার্যকর করে শোষণকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে, যে উৎপাদন পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: [অর্থনৈতিক] 'বিনিময়' নিরপেক্ষতা। অর্থাৎ শুনতে আশ্চর্য হলেও এই 'বিনিময় নিরপেক্ষ', সার্বজনীন ও সৃষ্টিশীল উৎপাদন প্রক্রিয়ারই বিশাল বহুত্ববাদী বিনিময় ক্ষেত্র হচ্ছে হাট। বলা যাক কীভাবে।

ধরা যাক, বালকটি আর তার বোন মিলে বৃহস্পতিবার হাটে বসার জন্য বুদ্ধি ফাঁদলো। তালপুকুরে গিয়ে হাটের দিন সকালে অনেক তাল বস্তায় ভরে নিয়ে এল। পরদিন সকাল সকাল দুই ভাইবোন মিলে হাটে গিয়ে পঞ্চাশেক ডাঁসা ডাঁসা তাল নিয়ে বসল। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা কোনো এক ব্যবসায়ী ধরা যাক রেশমের ব্যবসায়ী সেই সুন্দর সুন্দর তালগুলি দেখে নিজের বাড়ির জন্য নিয়ে গেলেন। ভাইবোন এখানে রেশম না কিনলেও যে 'বিনিময়' তার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের লোকটির মধ্যে সংঘটিত হল তা মূলত দুই ভিন্ন দেশের উদ্বৃত্ত দ্রব্যের মধ্যে, যে দ্রব্যের যোগান তাদের নিজ নিজ

দেশে তুলনামূলক ভাবে কম। তাই আমি বলতে চাইছি হাট হচ্ছে মূলগত ভাবে এমন ধরণের একটি উদ্বৃত্ত দ্রব্যের 'বিনিময়' ক্ষেত্র; যাকে আজ ইওরোপিয় দাস সভ্যতার বৈষম্যবাদী বিতরণ শৃঙ্খলার বিপরীতে প্রকৃতই সাম্যবাদী বিতরণ শৃঙ্খলা অর্থাৎ এমনতর শ্রমের বিতরণ বা বিভাগ থেকে উৎপাদনের উপকরণের বিতরণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণে অর্থাৎ শেষপর্যন্ত 'ভোগে' একটা সহজাত সাম্য বজায় রাখার আন্তর্জাতিকতাবাদী বাণিজ্য ক্ষেত্র হিশাবে আজ আমাদের পাপী [অ]সভ্য ও [অ] শিক্ষিতদের স্বীকার ও ধারণ করে নেওয়া উচিৎ এবং সাম্যবাদী আন্দোলনে শিক্ষার অভাব মিটিয়ে সংগ্রামের নীতি ও আদর্শকে নবর্নির্মাণ করে নেওয়া উচিৎ।

বহুত্ববাদী বললাম কারণ হাটে হয়ত উদ্বৃত্ত দ্রব্যের স্বাধীন উৎপাদক কিম্বা দেশি ও বহির্দেশী আগত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ঐ ভাইবোনের মত উৎপাদকের থেকে সাধারণ ভাবে বেশি; ঐ ভাইবোন হয়ত সব ঋতুতেই নিয়মিত এটা-ওটা নিয়ে হাটে বসে না, সেই হেতু নিয়মিত হাটে বসে এমন একজন উৎপাদককে দিয়ে আমরা যদি সংক্ষেপে এটি কেন তাদেরও উদ্বৃত্ত বাণিজ্য; তা দেখি, ধরা যাক দিনাজপুরের ফতেহপুর হাটে বসা এক বৃদ্ধ খই ও মুড়ি বিক্রেতাকে দিয়ে, যিনি সুদূর তিন মাইল ভেঙে চান্দোল থেকে ফতেহপুর হাটে এসে বসেছেন। অন্য দিন যেখানে আশেপাশের গ্রামে যেখানে হাট বসে তিনি সেখানে মুড়ি, খই নিয়ে যান। যে ধান থেকে এই খই তিনি তৈরি করেন, সেটি তিনি নিজে ফলান কিম্বা কিনে আনেন যাই হোক না কেন, যদিও সাধারণভাবে তিনি নিজেই ফলান, সেই ধানের মতই আর যা যা লাগছে মুড়ি বা খই বানাতে যেমন হাড়ি, উনুন, জ্বালানি সকল উপকরণ ও কাঁচামালই তাঁর নিজের কিম্বা তাঁর প্রতিবেশী কোনো স্বাধীন উৎপাদকের অধিকারে আছে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ জিনিস কি তুমি একা বানাও, নাকি তোমাদের এলাকায় আরো অনেকেই বানায়?' উনি জানালেন, 'এ তো ঘরে ঘরে লোকে তৈরি করে, খাবার জন্য, বেচতে আর কয়জন আসে।'

এখন সকলে যারা মুড়ি আর খই বানাচ্ছে তাঁরা সকলেই বেচতে আসে না, হয়ত অধিকাংশেই আসে না; এর কারণ হতে পারে বহুবিধ, আমি দ্বিবিধ ধরলাম, যেমন — যারা খায় সকলেই নিজে বানিয়ে নেয়, নয়ত, বাজারে অধিকাংশেই ঘরে ছাঁকা দেশি মুড়ি, খই খায় না, তারা দোকান থেকে কোম্পানিজাত কিনে খায়। শেষটি দিয়ে শুরু করলে যে সম্ভাবনাটা মূলত ডানা মেলে, তা হল: বাজার নাই। 'জাতীয়' চরিত্রের উচ্চফলনশীল বীজের ধান চাষ ও অটোরাইস-মিলে চাল প্রক্রিয়াকরণের যুগে মুড়ি, খই ইত্যাদিও কেন্দ্রীভূত কারখানায় তৈরি হচ্ছে শুধু নয়, চাল থেকে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া সব নিংড়ে নিয়ে এমনকি তেল উৎপাদনও চলছে বলেই ঘরে ছাঁকা দেশি মুড়ি অধিকাংশেরই খাদ্যতালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তার স্থান নিয়েছে কোম্পানিজাত মুড়ি, খই; এইক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে দাম প্রথমে নেমে যায়, পরে যখন ফুলে ফেঁপে

ওঠে ততদিনে আর ক্রেতার কোনো স্থানীয় স্বাধীন বিকল্প বাজার থেকে উৎখাত করা সম্পন্ন থাকে। বাঙলার হাটে বিভিন্ন জরুরি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সংকট আজ পাহাড়প্রমাণ, যেখানে বড় কর্পোরেট হাঙর সংস্থাগুলি বাঙলার বস্ত্র, নুন, শস্যবীজ, প্রসাধনী, মশলার অধিকাংশ বাজার দখল করেছে, কৃষি উপকরণে প্রতিবিপ্লব এনে বাঙলার মাটির সর্বনাশ করেছে এবং শস্যের বাজার কর্পোরেট মাফিয়াদের স্বার্থাধীন স্থানীয় নয়া সামন্তদের হাতে অর্পিত করেছে, কৃষিকে কৃষকের কাছে করে তুলেছে 'অলাভজনক'। আর যদি প্রথম উদাহরণটিকেই বৃদ্ধটির গ্রামের সকল মুড়ি খই উৎপাদকের হাটে মুড়ি খই না নিয়ে আসবার কারণ বিবেচনা করি, যা পাব, তা হল: এই মুড়ি বা খই খাবার জন্য অধিকাংশকেই বিনিময়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না বা কিনে খেতে হচ্ছে না, নিজেরাই উৎপাদন করে নিজেরাই ভোগ করছে। এখানেই আমাদের একইরকম আশ্চর্যের সমাধান পাওয়া গেল: এই যে অধিকাংশেই খাবারটি কিনে খাচ্ছে না, নিজেই ঘরে বানিয়ে খেয়ে নিচ্ছে, এটি আদতে আলোচ্য বিনিময় নিরপেক্ষ শ্রমবিভাজনের অংশ হিশাবেই ঘটমান হচ্ছে। খেয়াল করে দেখুন এটিও ফুলডাঙ্গার ভাইবোনটির মত সাধারণ ভাবে স্বাধীন, যৌথ, সৃষ্টিশীল উৎপাদকের সহজাত বিতরণ শৃঙ্খলার সমধর্মী যা বিনিময়-নির্ভর নয়। একটি গ্রামের অধিকাংশ লোক একই ধরণের শ্রম দিচ্ছে বা দিচ্ছে না: দুটি ক্ষেত্রেই তা স্থানীয় মুক্ত শ্রমবিভাগের সম্পূরক, কারণ বিনিময় এখানে ঘটছে মূলত অন্য গ্রামের সঙ্গে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ হিশাবে। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বিভিন্ন এলাকাগুলির উদ্বৃত্ত দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় ঘটছে।

এই বৃদ্ধজন নিয়মিত হাটে বিনিময় করতে আসলেও তিনি বিনিময়-নিরপেক্ষ উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিভূ। যে এলাকায় প্রচুর ধান ফলে না, সেখানকার লোকেদের মুড়ি আর খই কিনে খাওয়া আবশ্যক। এখন যে এলাকায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় সেই এলাকার লোকেরা খই আর মুড়ি শুধু নিজেদের খাবার জন্য বানাবেন না বরং কম ধান উৎপাদনকারী এলাকার চাহিদা মেটাতে তাঁরা মুড়ি, খই বানাবেন হাটে নিয়ে যাবার জন্য। অর্থাৎ একটি এলাকার উৎপাদকরা হাটে নিয়ে যাবার জন্য যে দ্রব্য উৎপন্ন করছেন সেটি সাধারণ ভাবে তার এলাকা বা গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য নয় [তার এলাকার লোকের কাছে সাধারণ ভাবে সেই দ্রব্যের যোগান আছে], বরং সেই দ্রব্য তিনি নিয়ে আসছেন উদ্বৃত্ত দ্রব্য হিশাবে যা তিনি নিজের এলাকায় দুষ্প্রাপ্য অন্য এলাকায় সহজলভ্য এমন উদ্বৃত্ত দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে বিনিময় করতে পারবেন। অতয়েব বৃদ্ধটি যে বললেন, 'বানায় সকলে, আসে আর কয়জনা' - এটি কোনো পুঁজির প্রভাবে নির্মিত অব্যবস্থা না হবার সম্ভাবনাও আছে, এটি এমনকি হাটের উৎসধর সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগের সহজাত সুব্যবস্থাও হতে পারে, যার মৌলিক ভিত্তিই হচ্ছে সার্বজনীন শ্রম।

বিষয়টি বাস্তবে যতটা সরল, তত্ত্বে ততই জটিল, কারণ এটি প্রকৃত সাম্যবাদী মুক্ত শ্রম বিভাজন বা কৌম সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের নিয়মনীতি বুঝতে চায়, যা বৈশিষ্ট্যে বহুত্ববাদী। এই উৎপাদন সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলি চিনবার আগে এতে নিয়োজিত শ্রমপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের কিছু আলাপ দরকার, যেখান থেকে আমরা বুঝে নেব সামাজিক শ্রমশক্তির কোন প্রকার অনুশীলন এবং ['অর্থনৈতিক'] মূল্যায়ন সাম্যবাদী আন্দোলনের যথার্থ বস্তুবাদী প্রকরণ হতে পারে। আদতে এর মধ্যেই সেই রহস্যও লুকিয়ে আছে যার জেরে [সামাজিক, অর্থনৈতিক] 'শ্রম'কেই খলনায়ক প্রতিপন্ন করতে হয়।

'ভোগবাদী অর্থনীতি' বলতে যে ধারণা বাজারে জনপ্রিয় আছে, সেই 'সামন্ততান্ত্রিক' ধারণা প্রমাণ করতে চায় যেকোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ঐতিহাসিক ভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ। আদতে এই ধারণা সর্বনাশা। এই ধারণা পুঁজিপতিদের লুঠ আর গণহত্যাকে আড়াল করতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাসকেই আড়াল করে। আমরা ইতিমধ্যেই এই দখলদারি-নিরপেক্ষ মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক পরিচিত হয়েছি। এখন দেখব, কীভাবে এই স্থানীয় [ভোগমূলক] বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন পদ্ধতি উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যায়ন করে, অর্থাৎ নিয়োজিত শ্রমপ্রক্রিয়া যখন অপরের সঙ্গে বিনিময় করবার জন্য দ্রব্য উৎপন্ন করছে, তখন সেই শ্রমপ্রক্রিয়ারও মূল্যায়ন কীভাবে ঘটছে। এই বিশালকায় গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে এই লেখায় সামান্য সূত্রপাত রাখাই যথেষ্ট স্থির করছি। আমরা এটিকে অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের বদলে, একটি অঞ্চলের স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে থেকেই আপাতত হিশাব করব।

ধরা যাক, একটি অঞ্চলে তিন প্রকারের জীবিকায় নিযুক্ত মানুষ থাকেন যথাক্রমে জেলে, তাঁতি ও কুমোর। এরা সকলেই নিজেরা চাষ করেন, নিজেদের বাড়িঘর নিজেরাই বানান ও আরো নানান উৎপাদন কর্ম করেন যেগুলি হাটে না নিয়ে গিয়ে নিজেরাই সরাসরি ভোগ করেন এবং বিশেষ ঋতুতে হয়ত হাটে নিয়ে যাবার লক্ষ্যেই অন্য উৎপাদন বা ব্যবসায়িক কর্মও করেন, কিন্তু মাছ ধরা, কাপড় বোনা ও বাসনপত্র বানানো তাঁদের কাছে সাধারণ ভাবে প্রধান পারম্পরিক কাজ। হিশাবের সুবিধার্থে ধরা যাক, যারা কুমোর, তাঁদের হাট থেকে কিনতে হচ্ছে মাছ ও কাপড়; যারা জেলে, তাঁদেরকে হাট থেকে কিনতে হছে কাপড় আর বাসনপত্র; আর যারা তাঁতি, তাঁদেরকে হাট থেকে কিনতে হচ্ছে মাছ আর বাসনপত্র। এখন পুঁজিতান্ত্রিক কারখানায় উৎপন্ন পণ্যে যেমন যন্ত্রপাতি-ক্ষয়জনিত মূল্য ও কাঁচামালের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয় উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য; যে বাড়তি মূল্যটিই পুঁজিপতির মুনাফার প্রধান উৎস; তার বদলে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যে যন্ত্রপাতি-ক্ষয়জনিত মূল্য, কাঁচামালের মূল্যের সঙ্গে যা সংযুক্ত হয় তা হচ্ছে: শ্রমশক্তির মূল্য। অর্থাৎ শোষণকে ছাইচাপা দিতে পুঁজিপতি

যে শ্রমের মূল্যের বদলে শ্রমশক্তির মূল্য শ্রমিককে মজুরি হিশাবে প্রদান করে, এই প্রকারের স্বাধীন সার্বজনীন উৎপাদন পদ্ধতিতে সেই শ্রমশক্তির মূল্যই আদতে দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়! ব্যাপারখানা ভেঙে বলি।

একজন জেলের সারা বছরে বিক্রি করা মাছের মোট মূল্য নির্ধারিত হবে তাকে সারা বছরে মোট যে মূল্যের কাপড় আর বাসনপত্র কিনতে হচ্ছে। তেমন ভাবেই একজন তাঁতির সারা বছরে বিক্রি করা কাপড়ের মূল্য নির্ধারিত হবে তাকে সারা বছরে মোট যে মূল্যের মাছ আর বাসনপত্র কিনতে হচ্ছে; এবং একইভাবে একজন কুমোরের সারা বছরে বিক্রি করা বাসনপত্রের মোট মূল্য নির্ধারিত হবে সারা বছরে মোট যে মূল্যের কাপড় আর মাছ তাঁকে কিনতে হচ্ছে। এটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন পদ্ধতির মূল্যায়নের নিয়ম, যার উদ্দেশ্য প্রধানত স্থানীয় ভোগ এবং বিনিময় উদ্বৃত্ত দ্রব্যের। চমৎকার সত্য হচ্ছে: বাৎসরিক হারে একজন উৎপাদক তাঁর শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদিত করতে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে যেটুকু মূল্য তিনি অপরকে দিচ্ছেন; সেই মূল্যই বাৎসরিক হারে সেই উৎপাদক নিজ উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে অপরের থেকে নিচ্ছেন। অতয়েব এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁর শ্রমের মূল্য হিশাবে শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের মূল্য বা শ্রমশক্তির মূল্যটিকেই দ্রব্যমূল্যের মধ্যে সংযুক্ত করছেন। আমরা বলতে পারি এই অঞ্চলের তাঁতি, জেলে ও কুমোররা তাঁদের দ্রব্য বিনিময়ের সাধারণ মূল্যমান হিশাবে নিজেদের শ্রমশক্তি পারস্পরিক ভাবে বিনিময় করছেন। এটি একইসাথে অর্জিত দক্ষতার মূল্য এবং অপারঙ্গমতার মূল্যও বটে। তাই তাঁদের স্বনির্ভরশীলতার সঙ্গে এই শ্রমশক্তির মূল্যের সম্পর্ক ব্যাস্তানুপাতিক। উৎপাদক যত স্বনির্ভর হবে তাঁর শ্রমশক্তির মূল্যমান তত কমবে; উৎপাদক যত বিনিময়নির্ভর হবে, তত তাঁর শ্রমশক্তির মূল্যমান বাড়বে। অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্য নাই হয়ে যাবার অর্থ শ্রম করবার ক্ষমতা অর্জন করতে অর্থাৎ বেঁচে থাকতে সাধারণ মূল্যের দরকার শেষ হওয়া বা মুদ্রার ব্যবহার গৌণ, বিলুপ্ত হয়ে পড়া। বলাই বাহুল্য, এই শৃঙ্খলায় প্রকারান্তরে সকলেই সমপরিমাণ শ্রম দিচ্ছেন, কেউবা উদ্বৃত্ত শ্রম দিয়ে কেউ বাণিজ্য করে ধন সঞ্চয় করছেন। অথচ এই সঞ্চিত ধন বা সাধারণ মূল্য হিশাবে সঞ্চিত টাকা যতই জমুক, সেই টাকার কোনো ক্ষমতা বা সুযোগ নেই অপরের উৎপাদন বা বাণিজ্য এমনকি অপরের চাহিদা বা যোগান লুঠ বা নিয়ন্ত্রণ করার। এর দুরকম কারণ থাকতে পারে। এক, সাধারণ পণ্য বা মুদ্রার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, যোগ্যতা না থাকা; আর দুই, ধরা যাক একজন সুতা কাটনি বহু সুতা কেটে পয়সা জমিয়ে একশোখানা চরকা কিনেছেন, এবং একশোজন লোককে ডেকে বলছেন, *"কাল থেকে আমার বারান্দায় তোমরা আমার তুলো আমার চরকায় বসে কাটবে, তার বিনিময়ে আমি তোমাদের এই পয়সা দেব"*- তাহলে সেই একশোজন লোক তাঁকে পরদিন সকালে একটা করে শাড়ি উপঢৌকন স্বরূপ উপহার দিয়ে যাবেন বড়জোর সাম্মানিক প্রত্যাখ্যান হিশাবে। কোন পরিস্থিতিতে তাঁরা ঐ একশোটি চরকার মালিকের প্রস্তাবে সম্মত হবেন? যখন সেই একশো জনের নিজ

নিজ চরকাগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে কিম্বা নিজের চরকা চালানোর জন্য অর্ধেক কাটনির আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে এবং একশো চরকার মালিকের কথায় সম্মত হওয়া ছাড়া জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য তাঁরা আর কোথাও কিনারা করতে পারছেন না, একমাত্র তখন। এই সুতা কাটনি যদি নিজে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করে সুতাকলও স্থাপন করেন, এবং অঞ্চলের সব কাপড় তাঁর ঐ সুতাকলে বানিয়ে দেবার কথা দেন, এবং কাপড়ের মূল্য আকস্মিক ভাবে নামিয়ে পর্যন্ত দিতে পারেন, তা হলেও সেই অঞ্চলের কৌমের কাছে তা হবে বিশৃঙ্খলা, অপরাধ; কারণ হাজার জনা তাঁতির মধ্যে নয়শো তাঁতি – তাতে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় মূল্য সংগ্রহ করতে অন্য রাস্তা দেখবেন, তাঁদের স্বনির্ভরতা লোপ পাবে, শ্রমশক্তির মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রয়ক্ষমতা কমতে কমতে নিজেরাই উদ্বৃত্ত মানুষে পরিণত হবেন। বোঝা দরকার এই ক্রয়ক্ষমতা কমার অর্থই শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা কমা। তাঁরা তুলনায় অসুস্থ হবেন। তাই এখানে কাপড়ের দাম কমে যাওয়া আদতে চোখে ধূলা দেওয়ার সমতুল্য ছল বলে গণ্য হবে। মনে রাখা দরকার এই ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবার আর এক অর্থ আবশ্যিক ভাবে বাজারে বিনিময়ের মূল্য বেড়ে যাওয়া। এই প্রকারে ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন বিনিময়কৃত মূল্যকে বাড়িয়ে চলে এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনেই একসময় সেই একশো লোককে উক্ত মূল্য শৃঙ্খলায় ঠিকা-সম্পর্কে কিম্বা নয়া দাস-সম্পর্কে যুক্ত করে, যা আবশ্যিক ভাবে বন্দুকধারী সেনা আর পুলিশের সক্রিয় বর্বরতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশেই আজ অবধি ভূমিষ্ঠ হয় নি।

জ্ঞানগঞ্জ তৃতীয় মাসিক পুঁথি অত্রি ভট্টাচার্য সম্পাদিত বিশ্বেন্দু নন্দ, শমীক সাহা ও অর্থনীতিবিদ দীপঙ্কর দে প্রণীত 'হকার চাষী কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থা'র একটি সমালোচনা নিবন্ধ 'কারিগরি উৎপাদন পদ্ধতি: একটি ভূমিকা' শীর্ষক লেখায় আমি এই উৎপাদন ব্যবস্থার দশটি প্রধান বিশেষত্ব চিহ্নিত করেছিলাম। সেগুলি নিম্নে আবার উল্লেখ করছি:

ক। উৎপাদনে উৎপাদকের স্বনিয়ন্ত্রণ, উৎপন্ন দ্রব্যের উপর উৎপাদকের অধিকার
খ। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা উৎপাদকের হাতে
গ। উপকরণের উৎপাদন, পুনরুৎপাদনও সাধারণভাবে উৎপাদকের হাতে
ঘ। জ্ঞান, প্রযুক্তির সার্বজনীন মালিকানা, এবং এই কারণেই প্রকাশে উৎকৃষ্ট সারল্য
ঙ। গুরু-চেলা/সামাজ/পারিবার/গোষ্ঠী পরম্পরা আর মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিচলন প্রবাহ
চ। বিকেন্দ্রীভূত বিভিন্ন উৎপাদনী এককে পারিবারিক শ্রম, গুরু-চেলার মিলিত শ্রম, একক উৎপাদকের শ্রম স্বপ্রযুক্তি বহুত্ববাদী কাঠামো
ছ। উৎপাদকদের মধ্যেকার পরস্পর নির্ভরশীলতা, উৎপাদক গ্রাহক ব্যবসায়ী পরস্পর নির্ভরশীলতা

জ। অনিয়ন্ত্রিত বাজার। হাট, ফেরি ও হকার ব্যবস্থা
ঝ। মরশুমি উৎপাদন। অর্থাৎ একজন উৎপাদক আদতে মাল্টি-উৎপাদক।
ঞ। সার্বজনীন, স্বাধীন, যৌথ ও সৃষ্টিশীল শ্রমপ্রক্রিয়া [সাধনপ্রক্রিয়া] নির্ভর; বিনিময় নিরপেক্ষ স্থানীয় জীবনপ্রণালীর [সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এখানে একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র্য নয়] মধ্যেই জীবনের নান্দনিক অভিব্যক্তি।

সর্বহারার একনায়কতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের সঙ্গে আদতে এর যতটুকু বৈরিতা, মতাদর্শগত যত না, তার বেশি নীতিগত। এই বৈরিতা [শ্রেণির শোষণমূলক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে] সর্বহারা শ্রেণিকেও বিলুপ্ত করবার উদ্দেশ্যে কৌমের পালনমূলক সভ্যতার নীতি উর্দ্ধে তুলে ধরার। আদতে যত না বৈরিতা, এটিই বিকাশ। আমরা তাই এই উৎপাদন পদ্ধতিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই সমাজতান্ত্রিক বলতে চাই মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, বিশ্বের সিংহভাগ এলাকায় যেখানে ক্রীতদাসতন্ত্র, ভূমিদাসতন্ত্র কিম্বা মজুরিদাসতন্ত্র কোনোদিনই অভ্যন্তরীণ শর্তে জন্ম নেয় নি, যে সব এলাকা ইওরোপে ভূমিদাসতন্ত্র থেকে মজুরিদাসতন্ত্রের 'উত্তরণে' কাঁচামাল, বেগার শ্রম, ধনসম্পদ ও জ্ঞান যুগিয়েছে, গত তিনশো বছরের ইতিহাস হল সেই সব এলাকার মানুষদের সংগ্রামের ইতিহাস, যাদের কাছে শ্রম এবাদতের বিষয়, কোনো হাড়ভাঙা দাসত্বের বিষয় নয়, তাঁরা জানান দিয়েছেন যে নিজেদের যৌথ জমি, সম্পদ, সরল জ্ঞান ও সহযোগিতাপূর্ণ সহাবস্থানের শ্রমবিভাগ তাঁরা ধ্বংস হতে দিতে চান না, এমনকি দাসতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রগতিতে তাঁরা সামষ্টিক ভাবে অংশগ্রহণও করতে চান না। মজুরিদাসতন্ত্র চাহিদাযোগান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে এই প্রগতিতে অংশগ্রহণ করবার চাহিদা উৎপাদিত করলেও তা নিছকই ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তি ইচ্ছার তাড়নায় সমষ্টিকে নাকচ করবার মধ্যে দিয়ে ধ্বংসের দিকে প্রগত হতে বাধ্য। এটিই তার প্রধান সীমাবদ্ধতা। অতয়েব সেই সব এলাকায় যেখানে সর্বহারা শ্রেণী গঠিত হয় নি, এমনকি ভূমিদাসও নাই বা ভূমিদাস থাকলেও তা পুঁজি গঠিত মজুরিদাসত্বেরই রূপফের মাত্র, সেখানকার উৎপাদকদের কাছে 'সর্বহারায়' পরিণত হওয়াটা কোনো ঐতিহাসিক প্রগতি বলে বিবেচিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র বলতে সাম্যবাদের অভিমুখে যে পর্যায়ক্রম চিহ্নিত করা হয়, তার অর্থনীতি 'শ্রমসময়' কমিয়ে স্থির পুঁজি বাড়ানোর তালেই সীমাবদ্ধ থাকলে সে কখনোই মুক্ত শ্রমবিভাজন কিম্বা উৎপাদনে ও উৎপাদনের উপকরণে স্বাধীন উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণ – কোনোটাই কায়েম করতে পারে না। কারখানায় শ্রমিক সমবায় আদতে একটি 'সাম্যবাদী' কিন্তু গণতান্ত্রিক, প্রতিনিধিত্বমূলক, আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলা; যেখানে মজুরির দাস হিশাবেই শ্রমশক্তির বদলে উৎপাদকরা হয়ত প্রকৃত শ্রমের মূল্য পান। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় কাঠামোর মধ্যে সাম্যবাদের উপাদান যত না আছে, তার ঢের বেশি আছে পুনরায় এটি পুঁজিবাদীদের হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা

ও উপাদান। আমরা একে খুঁটিয়ে বিচার করলে, অর্থাৎ মার্ক্সের 'পূর্বশর্ত' খুঁজে বের করবার রোগ নিজেদের গায়ে মেখে নিলে দেখি প্রগতির সমার্থক এই 'শ্রমসময়' কমাতে চাইবার আসল উৎস হচ্ছে শ্রমপ্রক্রিয়ার দখলদারিতে। যে শ্রম বেগার, সে শ্রম তো বিলুপ্ত হলেই ভালো। বেগার শুধু প্রাপ্য মূল্য না পাওয়ায় নয়, উদ্দেশ্যে, প্রক্রিয়ায় ও ফলাফলে উৎপাদকের কাছে তা অভিশাপস্বরূপ। দাস সমাজে, তা সে ক্রীতদাস হোক ভূমির দাস হোক কিম্বা মজুরির দাস; দাস সমাজ বিকাশের পরম্পরায় 'অর্থনৈতিক' শ্রম সর্বদাই শোষণের বিষয় হয়েছে বলেই মার্ক্সবাদীদের শ্রমের উপর এত রাগ। কিন্তু মার্ক্স কিম্বা মাও-এর মতোই আমরা জানি শ্রমই মনুষ্যের প্রধান কারণ। আর তাই, সমাজতন্ত্রকে কিম্বা সাম্যবাদী আন্দোলনকে আমরা আর কেন্দ্রীভূত কারখানার মধ্যে দিয়ে দেখি না। একই কারণে শোষণের বিলুপ্তিকেও শ্রমের বিলুপ্তির মধ্যে দেখি না। শ্রমের বিলুপ্তি আসলে মানুষের বিলুপ্তির সমান। তাই ঘোষণা করি, যে জগতে আমরা বাস করছি তার প্রতিটি প্রযুক্তির তথা প্রত্যয়ের আবির্ভাবের পূর্বশর্ত আমরা তদন্ত করব এবং রাইফেলের মত বিদ্যুৎকেও সাম্যবাদী আন্দোলনের স্বার্থে ব্যবহার করব তার পূর্বশর্তসমূহ সম্পর্কে সচেতন থেকেই।

পাঠক ঠিকই ধরেছেন, ইওরোপিয় শ্রেণিশোষণমূলক সভ্যতার বিপরীতে আমরা অইওরোপিয় নানান দেশের কৌম সভ্যতাকে একটি শোষণ নিরপেক্ষ ইতিহাসের পরম্পরা হিশাবে চিহ্নিত করছি, যাকে লুণ্ঠন ও হত্যা করে শ্রেণিশোষণমূলক সভ্যতার শেষতম উৎপাদন সম্পর্ক হিশাবে পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণির বিরোধ আবির্ভূত হয়েছে। কৌম সভ্যতার এই শ্রমবিভাগ যথার্থই সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও রাষ্ট্র নিরপেক্ষ, যার মধ্যেই শ্রেণিশোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের কিম্বা শোষণ বিলুপ্তির কিম্বা রাষ্ট্র বিলোপের মূল চাবিকাঠি মজুত আছে।

আদতে যে ধরণের সমাজতন্ত্রের কথা নামেমাত্র মার্ক্সবাদীরা বলেন, সেটি মূলগত ভাবে 'গণতান্ত্রিক' চরিত্রের, বলেই তাকে নির্ভর করতে হয় ও পরিচালিত হতে হয় একটা কেন্দ্রিকতার বিধিতে। এটি একপ্রকারের ঐতিহাসিক বাধ্যতা বটে। রাষ্ট্র নিজেকে নিষ্ক্রিয় ও নিকার করে তুলবে সমাজ জীবনে; আধুনিক রাষ্ট্রের যেকোনো কাজের মতোই এই কাজও কাঠামোয় বা পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বমূলক, আমলাতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলার মাধ্যমেই হয়ত সম্ভব। কিন্তু খোদ রাষ্ট্র পরিচালকদের মূল কাজ যদি হয় রাষ্ট্র বিলোপ, তবে তার নীতি কী হবে? অন্তত 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' নামে আজকের দিনে 'দেশি' পুঁজি বিকাশ নামক যে ডুমুরের ফুলটি একদিন পৃথিবীতে ফলবার লুণ্ঠনকারী গণহত্যাকারী প্রক্রিয়াটিকে বিপ্লবের কর্মসূচি হিশাবে গ্রহণ করে বিপ্লবীরা চূড়ান্ত পরাজিত, ব্যর্থ হয়েছেন; তা এমনকি সন্দেহজনক বলে গণ্য হওয়া উচিৎ, যা কোথাও কোনোদিনও আদতে ফলেই নি। আদতে, যে রাষ্ট্র চরিত্রমাত্রেই 'গণতান্ত্রিক', তার 'সমাজতান্ত্রিক' হবার আসল অর্থ

হল সমাজের স্বার্থে খোদ এই গণতান্ত্রিক কার্যপ্রক্রিয়াটির প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পিত ভাবে বিলুপ্ত করা, অর্থাৎ মুক্ত সাম্যবাদী শ্রম বিভাগ ও আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রবাহ শৃঙ্খলাকে পরিকল্পিত ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। এই মৌলিক কারণেই 'কারিগরি উৎপাদন পদ্ধতি' কিম্বা অবাধ বিতরণের 'হাট'কে আমরা কোনো রাখঢাক না রেখেই, উদ্দেশ্যজনিত ভাবেই সরাসরি সাম্যবাদের অভিমুখে অগ্রসরমান সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উৎপাদন পদ্ধতি কিম্বা সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদী বিনিময়ক্ষেত্র না বলার পিছনে কোনো কারণ দেখি না। তেমন কারণ অবশ্যই কেউ খুঁজে বার করতে পারেন, কিন্তু 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব'-এর যুগে তেমন কারণ খোঁজার উদ্দেশ্য কী হতে পারে ভেবে অন্তত আমাদের ভ্রূ সামান্য তো না কুঁচকে যায়ই না।

পর্ব তিন।।
শোষণ ও বৈষম্য বিলোপের সংগ্রামে হাটের পরম্পরা

"যে কঠোর *অর্থনৈতিক বাস্তবতার আজ আমরা মুখোমুখি হতে বাধ্য তা হল: মানব ইতিহাসে এর আগে কখনও এত কম সংখ্যক লোক এত বেশি সম্পদের মালিক ছিল না। মানব ইতিহাসে এর আগে কখনও এত আয় এবং সম্পদের বৈষম্য ছিল না। ইতিহাসে এর আগে কখনও ব্যক্তি মালিকানা এত বিপুল ছিল না। ইতিহাসে এর আগে কখনও এত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী কোটিপতি শ্রেণী আমরা দেখি নি। এর আগে কখনও শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে এই অভূতপূর্ব লোভ, অহংকার এবং দায়িত্বহীনতা আমরা দেখি নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের*

চেয়ে তিনজন লোক বেশি সম্পদের মালিক, যেখানে ৬০% এরও বেশি শ্রমিক 'বেকার-ভাতা' নিয়ে জীবনযাপন করেন। উৎপাদনশীলতায় ব্যাপক বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিতে বিস্ফোরণ সত্ত্বেও, গড় আমেরিকান কর্মীর জন্য প্রকৃত সাপ্তাহিক মজুরি আজ ৫০ বছর আগের তুলনায় কম। কিন্তু, অক্সফাম যেমন উল্লেখ করেছে, এটি স্পষ্টতই কেবল আমেরিকান সমস্যা নয়। এই সমস্যা বিশ্বের। ২০২০ সাল থেকে, যদিও সারা বিশ্বে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়েছেন, গ্রহের পাঁচজন ধনী ব্যক্তি দ্বিগুণ ধনী হয়েছেন এবং এখন তাদের সম্পদের পরিমাণ ৮০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবুন, ৮০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি সম্পদ - মাত্র পাঁচ জনের হাতে! যদিও সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, উপযুক্ত আবাসন বা তাদের বাচ্চাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেন, বিশ্বের কোটিপতিরা গত তিন বছরে তাদের সম্পদ ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বৃদ্ধি করেছেন। বিলিয়নেয়াররা আরও ধনী হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণী রোজ সংগ্রাম করছে এবং দরিদ্ররা হতাশায় বাস করছে। এই হল বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা।"
-বার্নি সন্ডার্স। সেনেটর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভূমিকা, অক্সফাম বার্ষিক বৈষম্য রিপোর্ট, ২৩/২৪

হাট সম্পর্কে তৃতীয় পর্বের এই সূত্রপাত হয় আপনার জন্য অনাগ্রহের হতে চলেছে, কারণ এই বিশ্বের দুর্দশা আপনি কিয়দ জানেন, নয়তো তা হতে চলেছে যথার্থই রোমহর্ষক। আমরা এখন তেত্রিশটি ধাপে বর্তমান বিশ্বের হাল হকিকৎ দেখব। যা এই কেন্দ্রিভুত মুনাফাবাদী বৈধ লুঠতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফসল; এবং যা একইসাথে গণহত্যা ও বিস্থাপনকে তার মুনাফার কায়দা হিশাবে মূলগত ভাবে ব্যবহার করে।

১। ২০২০ সাল থেকে অর্থাৎ এই দশকের শুরু থেকে, বিশ্বের পাঁচজন ধনী ব্যক্তির সম্পদ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, যেখানে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মানুষ তাদের সম্পদের পতন দেখেছে।
২। যদি পাঁচজন ধনী ব্যক্তির প্রত্যেকে প্রতিদিন এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে, তাহলে তাদের সম্মিলিত সম্পদ শেষ করতে ৪৭৬ বছর সময় লাগবে।
৩। বিশ্বের দশটি বৃহত্তম কর্পোরেশনের মধ্যে সাতজনেরই একজন বিলিয়নেয়ার সিইও বা একজন বিলিয়নেয়ার তাদের প্রধান শেয়ারহোল্ডার হিসেবে আছেন।
৫। বিশ্বব্যাপী পুরুষেরা মহিলাদের তুলনায় ১০৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি সম্পদের মালিক, যা আকারে মার্কিন অর্থনীতি চারগুণেরও বেশি।
৬। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১% লোক সমস্ত বৈশ্বিক আর্থিক সম্পদের ৫৯%- এর মালিক।
৭। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১% মানুষ মানবজাতির দরিদ্রতম দুই-তৃতীয়াংশের সমান

কার্বন দূষণ নির্গত করে।

৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একটি সাধারণ আফ্রো-আমেরিকিয় পরিবারের সম্পদ একটি সাধারণ শ্বেতাঙ্গ পরিবারের সম্পদের মাত্র ১৫.৮%। ব্রাজিলে গড়ে শ্বেতাঙ্গদের আয় আফ্রিকা-বংশধরদের তুলনায় ৭০% এরও বেশি।

৯। বিশ্বের ১৬০০ টিরও বেশি প্রভাবশালী কোম্পানির মধ্যে মাত্র ০.৪% কোম্পানি তাদের কর্মীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সুনিশ্চিত বেতন এবং জীবন ধারণে ন্যূনতম সেই আর্থিক সংহতি দিতে প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১০। বিশাল কোম্পানি 'ফরচুন ১০০'-এর একজন সিইও গড়ে এক বছরে যা আয় করেন তা পেতে স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে কর্মরতা একজন মহিলার ১২০০ বছর সময় লাগবে।

১১। ইউবিএস গ্লোবাল ওয়েলথ রিপোর্ট ২০২৩ এবং বিশ্বের বিলিয়নেয়ারদের ফোর্বসের তালিকা থেকে সর্বশেষ তথ্য দেখায় যে বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ২১%-এর প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও, উত্তর গোলার্ধের দেশগুলি বিশ্বব্যাপী সম্পদের ৬৯%-এর মালিক এবং বিশ্বের বিলিয়নেয়ার সম্পদের ৭৪%-এর ঠিকানা।

১২। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিশ্বজুড়ে সিইওদের বেতন উল্লেখযোগ্য% এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে - যা কর্মীদের সামান্য বেতন বৃদ্ধিকে অনেক বেশি ছাড়িয়ে গেছে। অক্সফাম এবং অ্যাকশনএইডের দ্বারা বিশ্বের বৃহত্তম ১৩৪টি কর্পোরেশনের ব্যবসা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে ২০১৭-২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ এবং ২০২২ সালে তাদের গড় মুনাফা ৮৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। ২০২৩ সালে ১৪টি তেল ও গ্যাস কোম্পানির মুনাফা ২০১৮-২১ সালের গড় থেকে ২৭৮% বেশি ছিল; এই কোম্পানিগুলি ২০২২ সালে ১৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৩ সালে ১৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অপ্রত্যাশিত মুনাফা পেয়েছে।

১৪। ২০২৩ সালে দুটি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের মুনাফা ২০১৮-২১ সালের গড় মুনাফার চেয়ে ১২০% বেশি ছিল, যা ২০২২ এবং ২০২৩ সালে ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৯.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অপ্রত্যাশিত মুনাফা নিশ্চিত করে।

১৫। বাইশটি আর্থিক শিল্প কর্পোরেশন ২০১৮-২১ সালের গড় মুনাফার তুলনায় ২০২৩ সালে তাদের মুনাফা ৩২% বৃদ্ধি করেছে এবং ২০২৩ সালে ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অপ্রত্যাশিত মুনাফা করেছে।

১৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০টি বৃহত্তম কর্পোরেশনের গড় নিট মুনাফার তুলনায় নিট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭। এগারোটি ওষুধ কর্পোরেশন ২০১৮-২১ সালের গড় মুনাফার তুলনায় ২০২২ সালে তাদের মুনাফা প্রায় ৩২% বৃদ্ধি করেছে এবং ২০২২ সালে ৪১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অপ্রত্যাশিত মুনাফা করেছে।

১৮। এই মুনাফা বিশালভাবে কয়েকটি কর্পোরেটের উপর কেন্দ্রীভূত: বিশ্বব্যাপী বৃহত্তম ০.০০১% সংস্থা সমস্ত কর্পোরেট মুনাফার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উপার্জন করে।

১৯। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে, ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ৬০ টি ওষুধ কোম্পানি মাত্র ১০ টি বিশাল, বিশ্বব্যাপী 'বড় ফার্মা'য় একীভূত হয়েছে। দুটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি এখন বিশ্বব্যাপী বীজ বাজারের ৪০% -এরও বেশির মালিক। বড় প্রযুক্তি সংস্থা'গুলি বাজারে যথেচ্ছ আধিপত্য বিস্তার করেছে: বিশ্বব্যাপী মানুষ অনলাইন বিজ্ঞাপন ব্যয়ের তিন-চতুর্থাংশ মেটা, অ্যালফাবেট এবং অ্যামাজনকে প্রদান করে এবং বিশ্বব্যাপী অনলাইন অনুসন্ধানের ৯০% এরও বেশি গুগলের মাধ্যমে করা হয়। এমনকি আফ্রিকার কৃষিক্ষেত্রও ফার্মে আত্তীকৃত। ভারতের কৃষিও ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভবনের মুখোমুখি, বিশেষ করে শীর্ষ পাঁচটি কোম্পানির দ্বারা।

২০। আইএমএফ গবেষণায় দেখা গেছে যে একচেটিয়া কর্পোরেট ক্ষমতার উত্থানের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন (ম্যানুফাকচারিং) ক্ষেত্রে শ্রম প্রতি আয় ৭৬% হ্রাস পেয়েছে

২১। চার দশক ধরে ১৩৪টি দেশের ৭০,০০০-এরও বেশি কোম্পানির তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাপী গড় মার্কআপ - মূল্য ও খরচের অনুপাত - ১৯৮০ সালে খরচের ৭% থেকে বেড়ে ২০২০ সালে খরচের ৫৯% হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, যে অল্প, একচেটিয়া সংস্থাগুলির প্রভাব ও ক্ষমতা বাজারে আধিপত্য তৈরি করেছে।

২২। চারটি কোম্পানি বিশ্বের বিষ কীটনাশক বাজারের ৬২% নিয়ন্ত্রণ করে।

২৩। বিশ্বব্যাপী অনলাইন বিজ্ঞাপন বাজারের তিন-চতুর্থাংশ মেটা, অ্যালফাবেট এবং আমাজন নিয়ন্ত্রণ করে।

২৪। ৯০% -এরও বেশি অনলাইন অনুসন্ধান শুধুমাত্র গুগলের মাধ্যমে করা হয়।

২৫। 'বিগ ফোর' কোম্পানি বিশ্বব্যাপী অ্যাকাউন্টিং-এর বাজারে আধিপত্য বিস্তার করেছে, যারা মোট ৭৪% বাজার শেয়ার ধারণ করে।

২৫। খাদ্য শষ্য থেকে শ্যাম্পু পর্যন্ত সুপারমার্কেটের তাকের অসংখ্য আপাতদৃষ্টির অনন্য পণ্য আসলে একই কর্পোরেশনের মালিকানাধীন নানান চিত্রের সমাবেশ। উদাহরণস্বরূপ, বিয়ার জায়ান্ট আনহিউসার-বুশ ইনবেভ ৫০০ টিরও বেশি ব্র্যান্ডের বিয়ারের মালিক, যার মধ্যে রয়েছে বাডওয়েজার, বেকস, করোনা এবং স্টেলা আর্টোইস।

২৬। গিলিয়েড, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ থেকে জনসাধারণের অর্থে তৈরি 'হেপাটাইটিস সি' চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত একটি ওষুধ 'সোফোসবুভির' কিনেছিল, তারপরেই এর দাম তিনগুণ বাড়িয়ে প্রতি রোগীর জন্য ১০০,০০০ ডলার করে দেয়া হয়, যার ফলে এটি কার্যত যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়।

২৭। উত্তর গোলার্ধের পুঁজি, বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে। ব্যবস্থাপনাধীন প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈশ্বিক সম্পদের মধ্যে ৫৬% উত্তর আমেরিকায়, ২৪% ইওরোপে এবং ১৮% এশিয়ায় স্থিত। এই তহবিলের অনেকখানি অংশ, যেভাবেই

হোক, দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে যায়। অনুমান, বেসরকারি পুঁজির প্রবাহ নিম্ন-আয়ের দেশগুলির (LIC) জন্য GDP-এর অংশ হিসাবে ODA-এর মত বিশাল, কিন্তু এই বিনিয়োগগুলি প্রধানত অনিশ্চিত, নড়বড়ে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বদলে প্রতিযোগিতা ও ফাটকাবাজির দিকেই ঝুঁকেছে। প্রান্ত-সাহারা আফ্রিকার উপর গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে বেসরকারি ইকুইটি বিনিয়োগগুলি অর্থ এবং আইসিটি খাতে ৮৩% বিনিয়োগ করেছে, চার মাত্র দেশে। একইভাবে, দক্ষিণ গোলার্ধের ৩১টি দেশের গবেষণা থেকে জানা যায় যে আর্থিক আয়ের বেশিরভাগ অংশই বৃহৎ কোম্পানিগুলি দ্বারা অর্জিত হয়, যা এই অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের উচ্ছিষ্ট ভাগ পাওয়া স্বল্প স্থানীয় অভিজাতদের ক্ষমতায়ন করে।

২৮। আইএলও অনুসারে, প্রতি বছর ২৩ লক্ষ শ্রমিক পেশাগত দুর্ঘটনা বা পেশা-সম্পর্কিত রোগের কারণে মারা যায়। ১ কোটি ৭৩ লক্ষ মানুষ বেসরকারি খাতে বলপূর্বক পরিশ্রমে বাধ্য নিয়োজিত থাকে, যাদের বেশিরভাগই দেশীয় এবং বিশ্বব্যাপী একচেটিয়াদের সরবরাহ শৃঙ্খলে কাজ করে।

২৯। OECD দেশগুলিতে ১৯৮৫ সালে ৩০% শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন; ২০১৭ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১৭%-এ নেমে এসেছিল। বিশ্বব্যাপী ১৬০০টিরও বেশি বৃহত্তম কোম্পানিগুলির 'বিশ্ব বেঞ্চমার্কিং অ্যালায়েন্স'-এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে এর মধ্যে মাত্র ০.৭% শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষির ক্ষমতা স্বীকৃত করে ও পূরণ করে যা স্পষ্টতই যৌথ দর কষাকষি বিষয়ে তাদের কৃতকর্ম এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষি ক্ষমতার সমর্থনে তাদের সঙ্গতি প্রকাশ করে। শক্তিশালী কর্পোরেশনগুলি তাদের সম্পদ এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে অনুকূল শ্রম আইন এবং নীতিমালা হাসিল করেছে যা একটি অসম স্থিতাবস্থা বজায় রাখে।

৩০। ৭৯১ মিলিয়ন শ্রমিক মুদ্রাস্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং গত দুই বছরে ১.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হারিয়েছেন, যা প্রায় এক মাস (২৫ দিন) এই প্রতিটি শ্রমিকের হারানো মজুরির সমান। ২০২২ সালে ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি ল্যাব দেখেছে যে বিশ্বের দরিদ্রতম অর্ধেক জনসংখ্যা বিশ্বব্যাপী আয়ের মাত্র ৮.৫% উপার্জন করেছেন। অনেক দেশে, দরিদ্রতম ৪০% পরিবারের আয় মোট আয়ের মাত্র একটি ছোট অংশ, উদাহরণস্বরূপ মেক্সিকো (৫%), নামিবিয়া (২.৫%), ইন্দোনেশিয়া (৩.৬%) এবং রোমানিয়া (১০.৪%)।

৩১। ২০১৯ সালে পুরুষদের দ্বারা অর্জিত প্রতি ১ মার্কিন ডলার আয়ে মহিলারা মাত্র ৫১ সেন্ট আয় করেছিলেন। মহিলারাও মহামারীর কারণে কঠোর অর্থনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং ২০২০ সালে সম্মিলিতভাবে প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলার আয় তারা হারিয়েছেন। ২০২২ সালে তাদের আনুমানিক আয় আনুমানিক ৩০%- এর চেয়ে সামান্য বেশি ছিল যা বিশ্বব্যাপী মোট আয়ের মাত্র ৩৫%। ১৯৯০ সালে ১৬০০ টিরও বেশি বৃহত্তম এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী কোম্পানিগুলি প্রকাশ

করেছে যে মাত্র ২৪% কোম্পানি লিঙ্গ সমতার প্রতি জনসমক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাত্র ২.৬% কোম্পানি পুরুষদের সাথে নারীর বেতনের অনুপাত সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে।

৩২। ২০২০ সালে, অক্সফাম অনুমান করেছে যে বিশ্বব্যাপী মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত অবৈতনিক সামাজিক কাজের আর্থিক মূল্য কমপক্ষে ১০.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বার্ষিক হারে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি শিল্পের আকারের তিনগুণ।

৩৩। জলবায়ু সংকট কিছু মানুষকে অবিশ্বাস্যভাবে ধনী করে তুলেছে, এমন সম্পদ তৈরি করেছে যা প্রায়শই জীবাশ্ম জ্বালানিতে পুনর্বিনিয়োগ করা হয় এবং ধনকুবেরদের কার্বন-নিবিড় জীবনযাত্রার তহবিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের অনেক ধনকুবের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করে এমন প্রক্রিয়াগুলির মালিক, নিয়ন্ত্রণ, গঠন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয় আমরা আগেই জেনেছি। জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলি ২০২২ সালে রেকর্ড আয় এনেছে, যার বেশিরভাগই বড় বাইব্যাক এবং লভ্যাংশের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের সমৃদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ২০২২ সালে অক্সফাম বিশ্বের ১২৫ জন ধনকুবেরের একটি বিশদ বিশ্লেষণ করেছে এবং দেখেছে যে, তাদের বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা গড়ে বছরে তিন মিলিয়ন টন কার্বন মনোক্সাইড নির্গত করে – মোট জনতার ৯০% অংশের কারও গড় নির্গমনের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশি।

এইবারে আমরা মাত্র তেরো দফায় গণহত্যা ও বিস্থাপনের আধুনিক লাভজনক 'বৈধ' অর্থনীতির মডেলটির সবচেয়ে নগ্ন কার্যকলাপ দেখব। জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রান্সেস্কা আলবানিজের রিপোর্ট থেকে প্রত্যক্ষ উদাহরণ হিশাবে ফিলিস্তিনিদের উপর ইজরায়েল রাষ্ট্রের চালানো গণহত্যার নজরানা টানব।

১। সামরিকশিল্প কমপ্লেক্স রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে, ইজরায়েল বিশ্বব্যাপী অষ্টম বৃহত্তম অস্ত্র রপ্তানিকারক রাষ্ট্র ছিল। দুটি সর্বাধিক বিশিষ্ট ইজরায়েলি অস্ত্র কোম্পানি - এলবিট সিস্টেমস, যা একটি পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব [পিপিপি] হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল, এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ৫০টি অস্ত্র প্রস্তুতকারকের মধ্যে রয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে এলবিট সিস্টেমস ইজরায়েলি সামরিক অভিযানে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে মূল কর্মী নিয়োগ করেছে এবং ২০২৪ সালের ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা পুরস্কার পেয়েছে। এলবিট সিস্টেমস এবং ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ অভ্যন্তরীণভাবে অস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ প্রদান করে এবং অস্ত্র রপ্তানিকারক সামরিক প্রযুক্তির যৌথ উন্নয়নের মাধ্যমে ইজরায়েলি সামরিক জোটকে শক্তিশালী করে।

২। অস্ত্র ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানকারী আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বর্ণবাদকে স্থায়ী করার এবং সম্প্রতি গাজায় আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইজরায়েলি ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ইজরায়েল F-35 যুদ্ধবিমানের জন্য সর্ববৃহৎ প্রতিরক্ষা ক্রয় কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক লকহিড মার্টিনের নেতৃত্বে ইতালীয় নির্মাতা লিওনার্দো এস.পি.এ ও অন্যান্য রাষ্ট্র সহ কমপক্ষে ১,৬৫০টি অন্যান্য কোম্পানির সাথে। বিশ্বব্যাপী নির্মাণরত এর বিভিন্ন উপাদান এবং যন্ত্রাংশ ইজরায়েলি F-35 বহরে অবদান রাখে, যা ইজরায়েল লকহিড মার্টিন এবং দেশীয় কোম্পানিগুলির সাথে অংশীদারিত্বে কাস্টমাইজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইজরায়েল ২০১৮ সালে যুদ্ধে প্রথম F-35 উড়িয়েছিল এবং ২০২৫ সালে 'বিস্ট মোডে' এটি ব্যবহার করেছিল। ইজরায়েলি বিমান বাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ লকহিড মার্টিন F-35 এবং F-16 যুদ্ধবিমানগুলির উল্লেখযোগ্য বহন এবং অগ্নিনির্বাপণ ক্ষমতা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে GBU-31 জয়েন্ট ডাইরেক্ট অ্যাটাক মিনিশন (JDAM) এবং আনগাইডেড MK-84S ২০০০-পাউন্ড বোমা; যেখানে একটি F-35 ১৮০০০ পাউন্ডেরও বেশি বোমা বহন করতে পারে। অক্টোবর ২০২৩-এর পর F-35 এবং F-16 গুঅস্ত্রগুলি ইজরায়েলকে আনুমানিক ৮৫,০০০ টন বোমা ফেলার অভূতপূর্ব আকাশ শক্তি দিয়ে সজ্জিত করার জন্য ব্যপক ভূমিকা পালন করেছে, যা ১,৭৯,৪১১ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা এবং আহত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং গাজাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

৩। গাজার আকাশে ড্রোন, হেক্সাকপ্টার এবং কোয়াডকপ্টার সর্বব্যাপী হত্যাযন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। এলবিট সিস্টেমস এবং ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা মূলত বিকশিত এবং সরবরাহ করা ড্রোনগুলি দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি উড়েছে, ফিলিস্তিনিদের উপর নজরদারি করছে এবং লক্ষ্যবস্তু গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করছে। গত দুই দশকে এই সংস্থাগুলির সহায়তায় এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতায় ইজরায়েল দ্বারা ব্যবহৃত ড্রোন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা এবং তার ঝাঁকের মত উড়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

৪। ইজরায়েলকে এই অস্ত্র সরবরাহ করতে এবং অস্ত্র রপ্তানি ও আমদানি লেনদেন সহজতর করতে, নির্মাতা কর্পোরেটেরা আইনি নিরীক্ষা এবং পরামর্শদাতা সংস্থার পাশাপাশি অস্ত্র বিক্রেতা, এজেন্ট এবং দালাল সহ মধ্যস্থতাকারীদের একটি জাল হিসাবে বিরাজ করে। জাপানি FANUC কর্পোরেশনের মতো সরবরাহকারীরা ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ, এলবিট সিস্টেমস এবং লকহিড মার্টিন সহ অস্ত্র উৎপাদন লাইনের জন্য রোবোটিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানি যেমন ডেনিশ এ.পি. মোলার মারস্ক এ/এস ২০২৩ সালের অক্টোবরের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সরবরাহকৃত সামরিক সরঞ্জামের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রেখে উপাদান, যন্ত্রাংশ, অস্ত্র এবং কাঁচামাল পরিবহন করে ব্যাপক মুনাফা লুটে চলেছে।

৫। এলবিট সিস্টেমস এবং ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের মতো ইজরায়েলি কোম্পানিগুলির জন্য চলমান গণহত্যা একটি লাভজনক ব্যবসা। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইজরায়েলি সামরিক ব্যয় ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিমাণ ৪৬.৫ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ বার্ষিক মুনাফাবৃদ্ধিকারী কোম্পানিগুলির অন্যতম। বিদেশী অস্ত্র কোম্পানিগুলি, বিশেষ করে গোলাবারুদ এবং অস্ত্র উৎপাদনকারীরাও এর মাধ্যমে লাভবান হয়েছে।

৬। ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী ডেটা প্রক্রিয়াকরণ এবং লক্ষ্যবস্তুর তালিকা তৈরি করার জন্য 'ল্যাভেন্ডার', 'গসপেল' এবং 'ড্যাডি কোথায়?' এর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা সরাসরি আধুনিক যুদ্ধকে পুনর্গঠন করে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বৈত-ব্যবহারের প্রকৃতি চিত্রিত করে। প্যালান্টির টেকনোলজিস ইনকর্পোরেটেড, যার ইজরায়েলের সাথে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দীর্ঘদিন ধরে, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের পরে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীতে তার সহায়তা প্রসারিত করেছে। বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে প্যালান্টির স্বয়ংক্রিয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পুলিশিং প্রযুক্তি, দ্রুত স্কেল-আপ নির্মাণ এবং সামরিক সফ্টওয়্যার স্থাপনের জন্য মূল প্রতিরক্ষা অবকাঠামো এবং তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করেছে, যা স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রিয়েল-টাইম যুদ্ধক্ষেত্র ডেটা ইন্টিগ্রেশনকে অনুমতি দেয়। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্যালান্টির ইজরায়েলের সাথে একটি নতুন কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করে এবং 'সংহতির জন্য' তেল আবিবে একটি বোর্ড সভা করে; ২০২৫ সালের এপ্রিলে, প্যালান্টিরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গাজায় প্যালান্টির ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে এমন অভিযোগের জবাবে বলেছিলেন, 'বেশিরভাগই সন্ত্রাসী, এটা সত্য' - এইসব বিভিন্ন ঘটনাই ইজরায়েলের বেআইনি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে নির্বাহী স্তরের জ্ঞান ও উদ্দেশ্য এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়।

৭। ৯/১১-পরবর্তী বিশ্বব্যাপী সিকিউরিটাইজেশনের উত্থানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ 'স্টার্ট-আপ জাতি' হিসেবে ইজরায়েল গণহত্যার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু স্টার্ট-আপের সংখ্যার দিক থেকে এটি বিশ্বব্যাপী প্রথম স্থানে রয়েছে, ২০২৪ সালে সামরিক প্রযুক্তি স্টার্ট-আপে ১৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গণহত্যা জুড়ে ইজরায়েলি রপ্তানির ৬৪ শতাংশ প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত।

৮। বেসামরিক প্রযুক্তি দীর্ঘকাল ধরে উপনিবেশ স্থাপনের দ্বৈত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে আসছে। ইজরায়েলি সামরিক অভিযান ফিলিস্তিনিদের তাদের জমি থেকে উৎখাত করার জন্য শীর্ষস্থানীয় বিশ্বব্যাপী অস্ত্রনির্মাতাদের সরঞ্জামের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে; বাড়িঘর, পাবলিক ভবন, কৃষিজমি, রাস্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস করে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এই যন্ত্রপাতি গাজার ৭০ শতাংশ কাঠামো এবং ৮১ শতাংশ ফসলি জমির ক্ষতি ও ধ্বংসের জন্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে দায়ী।

৯। কয়েক দশক ধরে, ক্যাটারপিলার ইনকর্পোরেটেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী সামরিক অর্থায়ন কর্মসূচির এবং ইজরায়েলি আইন দ্বারা সামরিক বাহিনীতে অধিগ্রহণ করা একচেটিয়া লাইসেন্স - উভয়ের মাধ্যমে ইজরায়েলকে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর এবং অবকাঠামো ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ, এলবিট সিস্টেমস এবং লিওনার্দো ডিআরএস, ইনকর্পোরেটেডের মালিকানাধীন RADA ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজের মতো কোম্পানিগুলির সাথে অংশীদারিত্বে, ইজরায়েল ক্যাটারপিলারের D9 বুলডোজারকে সামরিক বাহিনীর স্বয়ংক্রিয়, দূরবর্তী-কমান্ডেড মূল অস্ত্রে রূপান্তরিত করেছে, যা ২০০০ সাল থেকে প্রায় প্রতিটি সামরিক কার্যকলাপে মোতায়েন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অনুপ্রবেশ রেখা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনিদের হত্যা করার মাধ্যমে অঞ্চলটিকে 'নিরপেক্ষ' করা হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে, ক্যাটারপিলার সরঞ্জামগুলি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে নথিভুক্ত করা হয়েছে - যার মধ্যে রয়েছে বাড়িঘর, মসজিদ এবং জীবন রক্ষাকারী পরিকাঠামো ধ্বংস - হাসপাতালগুলিতে অভিযান চালানো এবং আহত ফিলিস্তিনিদের জীবন্ত কবর দেওয়াও রয়েছে। এবং স্বাভাবিক ভাবেই ২০২৫ সালে, ক্যাটারপিলার ইজরায়েলের সাথে আরো বহু মিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১০। কোরিয়ান এইচডি হুন্ডাই এবং এর আংশিক মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, ডুসান, সুইডিশ ভলভো গ্রুপ এবং অন্যান্য প্রধান ভারী যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনি সম্পত্তি ধ্বংসের সাথে যুক্ত, প্রতিটি একচেটিয়াভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইজরায়েলি ডিলারদের মাধ্যমে সরঞ্জাম সরবরাহ করে। ভলভোর লাইসেন্সধারী একটি OHCHR ডাটাবেস-তালিকাভুক্ত কোম্পানি এবং আরো কোম্পানিগুলি একসাথে মেরকাভিম ট্রান্সপোর্টেশন টেকনোলজিস লিমিটেডের মালিক, যা পরিষেবা উপনিবেশগুলিতে বিক্রি করা সাঁজোয়া বাস তৈরি করে। কমপক্ষে ২০০৭ সাল থেকে পূর্ব জেরুজালেম এবং মাসাফের ইয়াত্তা সহ ফিলিস্তিনি এলাকা ধ্বংস করার জন্য ভলভো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, এইচডি হুন্ডাই-এর যন্ত্রপাতি ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং জলপাই বাগান সহ কৃষিজমি ধ্বংসের কাজও করেছে এইসব যন্ত্র। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর, ইজরায়েল গাজার নগর ধ্বংসে এই কোম্পানিগুলির সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি করে, জাবালিয়া সহ রাফাহ ধ্বংস করার জন্য এর পরে সামরিক বাহিনী তাদের লোগোগুলিকে পর্যন্ত অস্পষ্ট করে দেয়।

১১। অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে দেশজ জনগোষ্ঠীর ইজরায়েল দ্বারা বিস্থাপনের সুবিধার্থে কোম্পানিগুলি ৩৭১ টিরও বেশি উপনিবেশ এবং অবৈধ ফাঁড়ি তৈরি, বিদ্যুৎ-এর ব্যবসা করেছে। ২০২৪ সালে, উপনিবেশগুলির প্রশাসন সামরিক বাহিনী থেকে বেসামরিক সরকারের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে এবং নির্মাণ ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট দ্বিগুণ হওয়ার পরে এটি তীব্রতর হয়েছে, উপনিবেশ নির্মাণের

জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। নভেম্বর ২০২৩ থেকে অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত, ইজরায়েল ৫৭টি নতুন উপনিবেশ এবং ফাঁড়ি স্থাপন করেছে, যেগুলি ইজরায়েলি এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলির যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং লজিস্টিক সহায়তা দ্বারা সংবদ্ধ।

১২। ড্রিপ সেচ প্রযুক্তিতে বিশ্বব্যাপী নেতা নেটাফিম, যার ৮০ শতাংশ এখন মেক্সিকান কোম্পানি অরবিয়া অ্যাডভান্স কর্পোরেশনের মালিকানাধীন, ইজরায়েলের সম্প্রসারণবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কৃষি প্রযুক্তি ডিজাইন করেছে। স্থায়িত্বের বিশ্বব্যাপী ভাবমূর্তি বজায় রেখে, নেটাফিম প্রযুক্তি ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে জল এবং জমিতে নিবিড় শোষণ কায়েম করেছে, ইজরায়েলি সামরিক-প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এদের সাথে মিলে সহযোগিতার নামে পরিমার্জিত হচ্ছে, একই সাথে ফিলিস্তিনি প্রাকৃতিক সম্পদকে আরও দখল ও ক্ষয়সাধন করছে। জর্ডান উপত্যকায়, নেটাফিম-সহায়তাপ্রাপ্ত সেচ ব্যবস্থা ইজরায়েলি ফসল সম্প্রসারণকে সহজতর করেছে, যেখানে ফিলিস্তিনি কৃষকরা - জল থেকে বঞ্চিত এবং ৯৩ শতাংশ অসেচযোগ্য জমি সহ - ইজরায়েলি উৎপাদনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তদুপরি, এই ধরনের সেচ কৌশল জর্ডান নদী এবং মৃত সাগরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

১৩। তনুভা এবং নেটাফিমের মতো কোম্পানিগুলি ইজরায়েলিদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি করে, যেখানে তারা যে খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত তা অন্যদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা - এমনকি দুর্ভিক্ষের কারণও হয়।

আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাবনা কী কী আছে তা দেখবার আগে আমরা দেখব আজও পুঁজির বিপরীতে যে কৌম দাঁড়িয়ে আছে সকল সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য, তার শক্তি কতটা অবশিষ্ট আছে। বার্নি সন্ডার্স যে পরিস্থিতির কথা লিখছেন, এশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজে তার সূত্রপাত এশিয়ার সংখ্যাগুরু মানুষের এমনকি এশিয়ার তদানীন্তন শাসক-শোষক শ্রেণীরও ইচ্ছানিরপেক্ষ, ইওরোপিয় শাসক-শোষক শ্রেণীর ইচ্ছাধীন 'প্রগতির' বদলে একটা 'লুঠতন্ত্রের' প্রতিষ্ঠা বলা সমুচিত, যা এখানকার কৌমের কাছে পাপস্বরূপ, তার পরিণতিতে বাঙলার বিশ্ববিধৃত শিল্পব্যবস্থা অর্থাৎ দক্ষতা, সম্পদ, প্রযুক্তি, বাজার দখল সম্পূর্ণ অর্থনীতি ধ্বংস করে বিশ্বশাসনে রাহাজানি করছে ইওরোপের যুদ্ধবাজ ধনকুবেররা। হয়ত প্রকৃতির নিয়ম, তবুও ইতিহাসের নিকৃষ্টতম উৎপাদন পরম্পরা দাস সভ্যতার কর্ণধাররা তাদের পাপের শাস্তি হিশাবে রেশম পথে বাণিজ্য করবার অধিকার হারালে যে যুদ্ধবাজ বণিকেরা সমুদ্রপথে দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দুস্তান খুঁজতে বেরুল, প্রথমে পৌছুল আমেরিকায়, সোনা রূপো লুঠ করে বড়দরের মুদ্রাভাণ্ডার দিয়ে পৃথিবীজোড়া ব্যবসার নামে বৈধ লুঠপাট শুরু করে। পঞ্চদশ শতকের শেষলগ্ন ও ষোড়শ শতকের আরম্ভলগ্ন, এই সময়েই আফ্রিকা, আমেরিকার কোটি কোটি স্বাধীন উৎপাদককে হত্যা ও বলপূর্বক দাস বানিয়ে তাঁদের উদ্বৃত্ত শ্রমে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। এবং এই সময়েই হে মাননীয় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পরজীবী 'শিক্ষিত' ছাগমহোদয়, দক্ষিণ এশিয়া

জুড়ে জেসুইট পাদ্রীদের উপনিবেশের মাধ্যমে এখানকার বিশাল বিস্তৃত বিচিত্র স্বাধীন উৎপাদক সমাজগুলির সাধারণ পারম্পরিক জ্ঞান অনূদিত হয়ে [শুধু দক্ষিণ এশিয়া থেকে চুরি হয়েছে আনুমানিক তিন কোটি পুঁথি] ইওরোপের শাসক শ্রেণির শোষণ ও লুঠতন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে চালান হয়ে ইওরোপ দেশে শ্রেণি শোষণমূলক সভ্যতার শেষতম অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুঁজির মতাদর্শ হিশাবে আধুনিক বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করল। *'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: একটি প্রতিবিপ্লব'* নিবন্ধে এবিষয়ে আগামী দিনে বিশদে লিখব, তবু এখানে বলাই বাহুল্য যে আধুনিক বিজ্ঞানের যথার্থ মালিক যারা সোনারূপী মুনাফায় মড়া, সেই ধনের কুমিররা কার্পণ্য ছেড়ে ধনের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে সাধারণ কোনো জ্ঞানের উন্নতির জন্য গবেষণা কাঠামো, কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়-আয়োজন করে নি, ধর্তব্যে আনা যাক খ্রিস্টীয় যাজকতন্ত্রগুলিই কলম্বাস থেকে ভাস্কোকে গণহত্যা অভিযানের জন্য নৌবহর দিয়েছে, তারাই আবার পরম্পরাক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক উদ্যোগী হয়ে উঠেছে; সারা বিশ্ব জুড়ে শোষণতান্ত্রিক পরম্পরার দাস সভ্যতা কায়েম ও আরো 'উন্নত' দাস সমাজ গড়বার অছিলায় জনসংখ্যাকে সমস্যা প্রতিপন্ন ক'রে, মানুষের আসল রহস্য তার সৃষ্টিশীল শ্রমপ্রক্রিয়াকেই খতম ক'রে মানব প্রজাতিকেই বিলুপ্তির দিকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে। এবং মানুষ বিজ্ঞানের বকলমে এই সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বকেই 'উন্নয়ন'-এর কাণ্ডারি মেনে তার নামে মূর্চ্ছা যাচ্ছে। এরই নাম প্রগতি, যা প্রকৃতিকে হত্যা করে অমানুষ হবার উদ্যোগ বিলক্ষণ গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের আর এক নাম শহরে ধনের চূড়ায় উঠে দড়ি টাঙিয়ে গলা ঝোলানো আত্মহননের নাম দেয় সুখ। যে সেই ধনের চূড়া পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় তাকে আমরা বলি 'জোকার'। এই 'প্রগতির'ই দৌলতে আমরা লালমুখোদের 'উন্নত' 'সভ্য' বলছি আর স্বদেশীদের 'অনুন্নত' 'অসভ্য' 'বর্বর' জ্ঞান করছি; আমরা জানছি আজ পুঁজিই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞানের প্রবাহ সম্ভব করল, অথচ জানলেও স্বীকার করছি না যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরেই মুক্ত জ্ঞানের প্রবাহ, প্রযুক্তির প্রবাহ, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রবাহ ছিল; কিন্তু ইওরোপ যেদিন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পদ, জ্ঞান লুঠপাট করবার অভিযান ও উপনিবেশকে 'আবিষ্কৃত' প্রবাহ বলে বিভিন্ন দেশে নিজের লুঠপাটকে বৈধতা দিতে পারল, সেদিন থেকেই 'অবাধ বাণিজ্য' নামে প্রকৃতই ঐতিহাসিক 'অবাধ পরম্পরার' বাণিজ্যপ্রবাহকে হত্যা করা শুরু; আজ যাকে আমরা ইওরোপের পেটেন্টজাত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলছি।

১৭৬৫ সালে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর নুন, তামাক আর সুপুরির উপর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার স্থাপন করে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এই তিনটি শিল্প বিনাশ করবার পর তারা ধ্বংস করে বাঙলার বস্ত্রশিল্প এবং আফিম। ৩ কোটি জনসংখ্যার বাঙলায় ছিয়াত্তরের গণহত্যায় ১ কোটি বাঙালি উৎপাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা করবার পর শুধুমাত্র বস্ত্রশিল্পে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধ্বংসকার্য

বাঙলায় ১০ লক্ষ তাঁতি পরিবার এবং প্রায় ২৫ লক্ষ সুতা কাটনিকে উৎখাত করে ব্রিটেনের সুতাকলে শিল্পবিপ্লব ঘটায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী বাঙলার গ্রামে নতুন সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণির মত নতুন সামন্ত ব্যবসায়ী [মহাজনি, সুদ-কারবারি] প্রচলিত হয়েছে, হাট পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পুঁজির বিশ্বস্ত দালাল আঞ্চলিক লুঠেরা মাফিয়া শ্রেণিগুলির উপর। তদাপি আমরা হাজির করছি আজকের চিত্র। এই চিত্র একচেটিয়া কর্পোরেট হাঙর সংগঠন ও তার বিপরীতে স্থানীয় উৎপাদকদের প্রকৃত তুল্যমূল্যের হিশাব আমাদের সামনে হাজির করে, যা পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্ক্সের বিশ্লেষণগুলির নির্ভুলতাই প্রমাণ করে। পুঁজির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক মুল্যায়ন করতে গিয়ে মার্ক্স দেখিয়েছিলেন যে পুঁজি মূলত সংখ্যাগুরুর শ্রম, সম্পদ লুটে সংখ্যালঘুর কুক্ষিগত অর্থনীতি তৈরি করে এবং সংখ্যাগুরু জনতাকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করে। মার্ক্স দেখাচ্ছেন, খোদ ইওরোপেও, পুঁজির তৈরি সংকট অর্থাৎ অধিকাংশ জনতাকে বেকার, ক্রয়ক্ষমতাহীন ও অনাহারী ছিন্নমূলে পরিণত করবার সংকট থেকে জনতাকে বাঁচায় স্বনিয়ন্ত্রিত বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদক ও অনিয়ন্ত্রিত বিক্রেতারাই। আমাদের প্রকল্প যখন বাঙলার হাট, তখন আমরা এই কর্পোরেট গণহত্যাবাদী মুনাফাবাদী বৈধ অর্থনীতির প্রবেশ বাঙলার প্রধান পারম্পরিক বাজার হাটের প্রাঙ্গণে কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতেই নিবিষ্ট থাকব। আলোচনার সুবিধার্থেই আমরা এখানে খাদ্যপণ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্য যেমন শস্যবীজ, বস্ত্র, মশলা, ভোজ্য তেল, জুতো : পশ্চিমবঙ্গে ইত্যাদি পণ্যদ্রব্যের বাজারে কর্পোরেট সংগঠন ও স্থানীয় উৎপাদকদের অংশ হিশাব রাখলাম। বার্নি সন্ডার্স কার প্রতিনিধি জানা নাই, তবু তাঁর উদ্বেগের কাঠামোগত কারণ এবং কাঠামোগত পরিত্রাণ দুইয়েরই বয়ান নিম্নের তথ্যাদির মধ্যে বর্তমান আছে।

১। বর্তমানে পশ্চিমবাঙলায় খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংগঠনগুলির মোট দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা থেকে ৩০০ কোটি টাকা; যা মোট বাজারের ৬৫% থেকে ৭০% পর্যন্ত; অন্যদিকে পশ্চিমবাঙলার সমস্ত হাটগুলির মোট দৈনিক লেনদেন আনুমানিক ১৫০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকা; যা মোট বাজারের ৩০% থেকে ৪০% পর্যন্ত। পাঠক অবশ্যই মাথায় রাখবেন প্রতি ১০০ টাকা লেনদেনে কর্পোরেট যদি ১০ একক দ্রব্যের লেনদেন করে, তবে প্রতি ১০০ টাকা লেনদেনে হাট লেনদেন করে ন্যূনতম তার তিনগুণ, অর্থাৎ ৩০ একক দ্রব্যের।

২। বর্তমান পশ্চিমবাঙলায় কর্পোরেট উৎপাদন, বিতরণ ও সেবা সংগঠনগুলির মোট কর্মসংস্থান ৫ লক্ষ স্থায়ী কর্মচারী, যার ২০% থেকে ৩০% নারী। অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত [আদতে উৎপাদক নিয়ন্ত্রিত] হাটের বহুত্ববাদী উৎপাদন ও বিতরণ কাঠামোর মোট কর্মসংস্থান আনুমানিক এক কোটির উর্দ্ধে, যার মধ্যে ৬০% থেকে ৭০% নারী।

৩। কর্পোরেট পণ্যগুলির দাম জিএসটি, প্যাকেজিং ও মার্জিন সহ হাটের পণ্যের তুলনায় ৩০% থেকে ৫০% বেশি।

৪। পশ্চিমবাঙলায় কর্পোরেট সংগঠনগুলির বার্ষিক 'ব্যাটারির জল' মেশানো মশলার মোট উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ১.৫ লাখ টন থেকে ২ লাখ টন, যা রাজ্যের মোট মশলা বাজারের ৪০% থেকে ৪৫% পর্যন্ত উৎপন্ন করে, এবং যে বিষাক্ত মশলার ৭০ শতাংশই উৎপন্ন হয় কলকাতা-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে। উল্টোদিকে শীর্ষে থাকা মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম ও অন্যান্য জেলার স্থানীয় স্বাধীন উৎপাদকদের মোট বার্ষিক স্বাস্থ্যকর মশলা উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে আনুমানিক ২.৫ লাখ টন থেকে ৩ লাখ টন; যা রাজ্যের মোট বাজারের ৫৫% থেকে ৬০% উৎপন্ন করে।

৫। মশলার ক্ষেত্রে কর্পোরেটদের মোট বার্ষিক উৎপাদন ১.৫ লাখ/২ লাখ টন মশলার মোট মূল্য হল ২৫০০ কোটি টাকা থেকে ৩০০০ কোটি টাকা। উল্টোদিকে স্থানীয় হাটে বসা স্বাধীন উৎপাদকদের মোট বার্ষিক উৎপাদন ২.৫ লাখ/৩ লাখ টন মশলার মোট মূল্য হচ্ছে ৮০০ কোটি টাকা থেকে ১০০০ কোটি টাকা। কর্পোরেটের কেমিক্যাল মেশানো বিষাক্ত পণ্যের দাম তার ব্রাণ্ড প্রিমিয়ামের জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকর পণ্যের তুলনায় ৩০% থেকে ৫০% বেশি।

৬। মশলার ক্ষেত্রে, উৎপাদনে কিম্বা বিতরণে, কর্পোরেটদের মোট কর্মসংস্থান আনুমানিক ৫০,০০০ জন শ্রমিক কর্মচারী। অন্যদিকে স্থানীয় মশলার উৎপাদন ও বিতরণ কাঠামোয় কর্মসংস্থান ১৫ লক্ষেরও বেশি স্বাধীন উৎপাদক ও বিক্রেতার। নারীর অংশগ্রহণও এইক্ষেত্রেও কর্পোরেট খাতে ২০%-এর নিচে, এবং স্থানীয় খাতে ৭০%-এর উপরে।

৭। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত মশলার বৈদেশিক বাণিজ্যে কর্পোরেটদের দখল ৬০% থেকে ৭০% এবং স্থানীয় স্বাধীন উৎপাদকদের দখল ১৫% থেকে ২০% মাত্র।

৮। পশ্চিমবঙ্গে কর্পোরেট অবকাঠামোয় ২০২৪ সালের সরকারি বিনিয়োগ ৫০০ কোটি টাকা, যেখানে স্থানীয় উৎপাদনের পরিকাঠামোয় সরকারি বিনিয়োগ মাত্র ১০০ কোটি টাকা। FSSAI -এর নামে স্থানীয় উৎপাদনকে বেআইনি, অস্বাস্থ্যকর, কালো ব্যবসা দাগিয়ে ২০২৪ সালে মোট ২০০টি মশলার স্থানীয় উৎপাদনের ইউনিট বলপূর্বক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৯। পশ্চিমবঙ্গের বাজারে মোট শস্যবীজের ৭০% থেকে ৮০% উৎপাদন করে কর্পোরেট সংগঠনগুলি, যা প্রধানত হাইব্রিড ধরণের, অর্থাৎ 'কেমিক্যাল মেশানো' বিভিন্নপ্রকারের বিষ। উল্টোদিকে স্বাস্থ্যকর দেশি বীজ স্থানীয় স্বাধীন উৎপাদকের হাতে উৎপাদিত হয় রাজ্যের মোট উৎপন্ন শস্যবীজের ২০% থেকে ৩০% মাত্র। এই কর্পোরেট বিষাক্ত শস্যবীজের উৎপাদন ক্ষেত্র হয়েছে মূলত বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়ার মতন জেলাগুলি, যেখানে স্থানীয় দেশি শস্যবীজের উৎপাদন এখনো টিকে রয়েছে মালদা, বীরভূম, কোচবিহার ইত্যাদি জেলাগুলিতে।

১০। কর্পোরেট শস্যবীজের দাম কেজি প্রতি হাইব্রিড-ধান বা ভুট্টার ক্ষেত্রে ৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত, যার মধ্যে ৫০% থেকে ৭০% মূল্যই হল প্রযুক্তি ও প্যাকেজিং-এরই সংযোজন; এবং যা থেকে কর্পোরেট কয়েকটি মাত্র সংগঠনের বার্ষিক মুনাফা ১২০০ কোটি টাকা থেকে ১৫০০ কোটি টাকা, যা শ্রমশক্তির মূল্য হিশাবে বৈষম্যমূলক ভাবে বিতরিত হচ্ছে কর্পোরেট শস্যবীজের মোট কর্মসংস্থান ৫০,০০০ শ্রমিক ও কর্মচারীর মধ্যে। অন্যদিকে স্থানীয় উৎপাদকের উৎপন্ন দেশি ধানের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা থেকে ৬০ টাকা আর সবজির বীজের দাম ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত। স্থানীয় শস্যবীজের মোট বাৎসরিক আয় ৩০০ কোটি টাকা থেকে ৪০০ কোটি টাকা, যা এই খাতে মোট কর্মসংস্থান ৫ লক্ষেরও বেশি জনতার মধ্যে সমতা বজায় রেখে বিতরিত হচ্ছে।

১১। স্থানীয় বীজ উৎপাদনে নারীদের অংশগ্রহণ এইক্ষেত্রেও ৭০%-এর বেশি, যেখানে কর্পোরেটদের বীজ উৎপাদন কাঠামোয় নারী অংশগ্রহণ আবারো ২০%-এর কম।

১২। পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্রশিল্পে কর্পোরেট সংগঠনগুলির মোট বাজার শেয়ার ৬৫% থেকে ৭০% পর্যন্ত, যার মোট বার্ষিক আনুমানিক মূল্য ১৫০০০ কোটি টাকা থেকে ১৮০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত। উল্টোদিকে বস্ত্রশিল্পে স্থানীয় স্বাধীন উৎপাদকদের মোট বাজার শেয়ার ৩০% থেকে ৩৫% পর্যন্ত, যার মোট বার্ষিক আনুমানিক মূল্য ৭০০০ কোটি টাকা থেকে ৮৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত।

১৩। পশ্চিমবঙ্গে মোট বস্ত্রের প্রায় ৭০% উৎপাদন করা ও তার ব্যবসায় মোট কর্পোরেট কর্মসংস্থান ৫ লক্ষ জনতার। অন্যদিকে এই রাজ্যেই মোট বস্ত্রের মাত্র ৩০% উৎপাদন করা ও তার ব্যবসায় স্থানীয় স্বাধীন কারিগর ও কারবারিদের মোট কর্মসংস্থান ১৮ লক্ষেরও বেশি। এইক্ষেত্রেও সুতা কাটায়, বুননে, রেশম চাষে নারীরা অগ্রগণ্য, তাঁদের অংশগ্রহণ ৭০%-এর বেশি।

১৪। এই রাজ্যের কর্পোরেট উৎপাদিত বস্ত্রে ব্র্যাণ্ডিংজনিত মূল্য সংযোজন ৩০% থেকে ৪০%; অন্যদিকে সূক্ষ্মতম দক্ষ গুণী শ্রমসময়, প্রধানত শ্রমশক্তিজনিত কারণে স্থানীয় স্বাধীন উৎপাদকের দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রে মূল্য সংযোজন ৬০% থেকে ৮০%পর্যন্ত।

১৫। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৫%-এরও কম স্থানীয় কারিগরদের হাতে।

১৬। পশ্চিমবঙ্গে কর্পোরেট বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসার অবকাঠামোয় সরকারি বিনিয়োগ ২০২৪ সালে ৫০০০ কোটি টাকারও বেশি, যেখানে স্থানীয় বস্ত্র উৎপাদন ও বাণিজ্যের পরিকাঠামোয় সরকারি বিনিয়োগ [তাঁত গ্রাম প্রকল্প] মাত্র ৫০০ কোটি টাকা।

১৭। পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোজ্য তেল বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ৮০% থেকে ৮৫% পর্যন্ত কর্পোরেৎ একচেটিয়াদের দখলে, যা মূওত আমদানি-নির্ভর, যার মোট বার্ষিক পরিমাণ ১২ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টন তেল পরিশোধিত। এর মধ্যে ৯০%-এরও বেষী আমদানিকৃত সয়াবিন ও পামতেল। উল্টোদিকে এই রাজ্যের ভোজ্য তেল বাজারের মাত্র ১৫% থেকে ২০% স্থানীয় উৎপাদকদের দখলে, যা পরিমাণে বার্ষিক ২ লক্ষ

থেকে ৩ লক্ষ টন অপরিশোধিত তেল উৎপন্ন করে।

১৮। কর্পোরেট ভোজ্য তেলের টনপ্রতি উৎপাদন খরচা ৮০০০ টাকা থেকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত, যেখানে স্থানীয় উৎপাদকদের টনপ্রতি উৎপাদন খরচা ৫০০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত। কর্পোরেট তেলের দাম ২৫% থেকে ৩০% বেশি, যেখানে স্থানীয় তেল ৪০% থেকে ৫০% সাশ্রয়ী। জেনে রাখা ভালো, আন্তর্জাতিক বাজারে সয়াবিনের দাম টনপ্রতি ৫০০ ডলার বাড়লে তেলের দাম বৃদ্ধি পায় গড়ে ২৮% করে।

১৯। এই রাজ্যের ৮৫% বাজার দখল করে থাকা কর্পোরেট ভোজ্য তেলের আমদানি, উৎপাদন আর ব্যবসায় নিয়োজিত সংস্থান হয় আনুমানিক ৫০,০০০ শ্রমিক কর্মচারীর। আর উল্টোদিকে ১৫%-এরও কম বাজার দখল করে থাকা স্থানীয় ভোজ্য তেল উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত সংস্থান হয় ৩ লক্ষেরও বেশি জনতার। এখানেও নারীদের অংশগ্রহণের হার কর্পোরেটে ২০% থেকে ২৫% এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে ৬০% থেকে ৭০% পর্যন্ত। জেনে রাখা ভালো, বহাল আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলা কোনোভাবে একদিন ব্যহত হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির আমদানি ব্যয় শুধুমাত্র ভোজ্য তেলের পিছনে ৪৬,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

২০। পশ্চিমবঙ্গে জুতোর বাজারে কর্পোরেটদের বাজার দখল ৭০% থেকে ৭৫%; বার্ষিক উৎপাদন ৮০ লক্ষ জোড়া। মূল্য জোড়াপ্রতি ৩০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে স্থানীয় উৎপাদকদের বাজার ২৫% থেকে ৩০% মাত্র। বার্ষিক উৎপাদন মোট আনুমানিক ৩০ লক্ষ জোড়া। মূল্য জোড়াপ্রতি ৫০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত।

২১। জুতোর উৎপাদন ও বিতরণে কর্পোরেটদের ৭৫% বাজার থাকলেও, কর্মসংস্থান মাত্র ৫০,০০০ শ্রমিক কর্মচারী। অন্যদিকে স্থানীয় স্বাধীন কারিগরদের জুতোর বাজার ২৫% হলেও তার দেয় কর্মসংস্থান ৩ লক্ষেরও বেশি জনতা। কর্পোরেটের জুতোয় ব্রাণ্ডিং আর প্রিমিয়ামে স্থানীয় জুতোর থেকে গড় দাম ১০০% থেকে ৩০০% বেশি।

এই তথ্যখানা থেকে একটা কথা পরিষ্কার, তিনশো বছর ধরে বিশিল্পায়নের এই উপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক 'বৈপ্লবিক' আন্দোলন সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মাফিয়া ও তাদের দেশি দালাল 'ভারতীয়' দস্যুবণিকদের দল বাঙলার স্বাধীন উৎপাদকদের রক্তবীজ কৌম পরম্পরা, যেকোনো মানব সভ্যতার আসল রহস্য সেই পরম্পরাকে যথারীতিই ধ্বংস করতে তো পারেই নি, এমনকি বিস্তৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ বাজারে কর্পোরেট হাঙরদের প্রবেশের ক্ষমতা বা যোগ্যতা অনেকাংশেই ক্ষীণ দেখা গেছে। তাত্ত্বিকরা যে পরিবেশে বাস করেন, তাতে তাঁরা নিজেরা পুঁজির পকেটে বাস করেন বলে মনে করেন, তাই গোটা দুনিয়াই যে পুঁজির অতল কবলে, এর কোনো বিকল্প বা একে পরাস্ত করবার যেকোন রাস্তাই হচ্ছে অলীক: এইসব ফেরেববাজি জায়েজ ভাবে চালাতে পারেন।

আমরা একাধিক জেলার হাটে ঘুরে দেখেছি, প্রধানত কৃষি উপকরণ হিশাবে বীজ, সার, কীটনাশক; বস্ত্র; নানা প্রসাধনী পণ্য; এবং খাদ্যপণ্য হিশাবে নুন, তেল, মশলা ইত্যাদি কিছু প্রধান পণ্য ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের হাটগুলিতে কর্পোরেট অবস্থিতি প্রায় শূন্য। গত তিনশো বছরের উপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো কর্পোরেট ধনকুবেরদের স্বার্থে সশস্ত্র পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সব উপরিউক্ত দ্রব্যের স্থানীয় উৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্য ধ্বংস করেছে ও সেই স্থানে দুষ্ট কর্পোরেট আন্তর্জাতিক মাফিয়াচক্রকে হাজার হাজার কোটি টাকার অবকাঠামো তৈরি করে দিয়ে মুনাফাবাদী লুঠতন্ত্রকে বেলাগাম প্রবেশাধিকার দিয়েছে। ফলস্বরূপ উচ্ছেদ, কর্মহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পণ্যের বেলাগাম দাম আর হাজার হাজার কোটি টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করে জনমত প্রভাবিত করে অতিচাহিদা ও অতিউৎপাদনের মহড়ায় জনতাকে দিন দিন আরো নিঃস্ব করার দিকে এগিয়ে চলেছে। এমনকি এত জনসংখ্যা তাঁরা আর নিতে পারছেন না বলে মানব প্রজাতিকেই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করবার কায়দায় নেমেছেন, কখনো বায়লজিকাল যুদ্ধ মহামারি দিয়ে, কখনো বেনাগরিক বানিয়ে গণহত্যা করে কিম্বা আবার কখনো সভ্যতার নামে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অদ্ভুতুড়ে দাবিকে জনপ্রিয় করে। ভারতবর্ষে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আপাত বাজার বড়জোর ৪%, অন্যদিকে ভারতবর্ষেরই প্রায় ৭৮% মানুষ দৈনন্দিন বাজার করেন রাস্তায় বসে থাকা মুক্ত উৎপাদক ও বিক্রেতা হকার ও ফেরিওয়ালার থেকে। এই ৭৮% জনতার কাছেই রোজ হাজার হাজার বিজ্ঞাপন যায় হকার ও ফেরিওলাদের প্রতি তাঁদের ঘৃণা ও সন্দেহ বাড়ানোর জন্য এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মত একটি বৈষম্যের বিস্ফোরণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় বাড়ানোর জন্য। আদপেই চূড়ান্ত ঢপ 'কৃত্রিম' বুদ্ধিমত্তা, যা কি না বিশ্বজুড়ে লাখ কোটি আইটি ও ভাষা শ্রমিকদের নিরন্তর শ্রমশক্তি আর বিশ্বব্যাপী ইন্টার্নেটে ব্যবহারকারী জনতার বেগার শ্রম লুটের উপর দাঁড়িয়ে নিজের '[অ]কৃত্রিম' বুদ্ধির নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে জনতাকে ঘোল খাইয়ে চলেছে। আদতে যা তার সিস্টেমে সংযোজিত হচ্ছে তাই সে ফিরিয়ে দিচ্ছে: এই সহজ সত্যটি আলাদা করে খেয়াল করবার কোনো দরকার এখানে কারু নেই। সকলেই সম্মোহিত অথচ ভুলে মেরেছেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধাক্কায় শুধুমাত্র বস্ত্রশিল্পেই ২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিন বছরে প্রতি ৩২ জন কর্মীর ২৮ জন করে ছাঁটাই হয়েছেন, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কাজ হারিয়েছেন ৬৯% কর্মী, গাড়ি ও অন্যান্য কারখানায় হাজার হাজার রোবট বসায় লাখ লাখ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন; জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে গ্রামীণ বিদ্যালয় ব্যবস্থাও বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ উঠেছে সেই ২০০৮ সালের আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে, আইটি এবং পলিটেকনিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত লাখ লাখ বাহিনী সংখ্যায় আরো বেড়ে চলেছে অথচ সংস্থান প্রতি বছর গুণিতক হারে নামছে; আমরা প্রবেশ করতে চলেছি এক ভয়ানক দুনিয়ায়। এটি ঘটছে সেই সব প্রযুক্তির জন্যেই, যেগুলি মানুষ তার সামষ্টিক প্রয়োজনে উদ্ভাবন করে নি বরং শোষণের উদ্দেশ্যে কর্পোরেট মুনাফাবাদী শাসকের স্বার্থে, যাকে ঘিরে

আমাদের আজকের সম্মোহন না কাটলে আগামী দিনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়ানক পরিস্থিতি, যখন এর পরের প্রজন্মের গ্রামীণ প্রাপ্তবয়স্করা, যারা আজ কৃষিজমি হারিয়ে বা কৃষির অলাভ দেখে মুখ ফিরিয়ে ইতিমধ্যেই পরম্পরাবিচ্ছিন্ন 'আধুনিক' 'সভ্য' 'নাগরিক' হয়ে উঠছেন, তাঁরা কেউ আর সারি বেঁধে শহরে রাস্তার দুইপাশ জুড়ে পরবর্তী প্রজন্মের মন্দা সামলাতে ফলমূল, শাক সবজি, বাসনপত্র, মশলা, খাবার কিছু নিয়েই বসে থাকবেন না। থাকবে মাত্র স্পেন্সার্স, থাকবে মাত্র স্মার্ট বাজার।
সমস্যা হল আমরা প্রকল্পকে দেখি বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সংঘাত দিয়ে। এর জন্যে ফয়েরবাখ দায়ী নাকি এঙ্গেলস: এই দুশ্চিন্তা আমাদের ঐ চিন্তাপ্রক্রিয়ারই ফল। এতে প্রধান সমস্যা হল দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে ধ্বংস এবং মিলনের ফারাক করা। দ্বন্দ্বের নিয়মে এটি একই ঘটনার দ্বিবিধ প্রকাশ। আদতে দ্বন্দ্ব আমরা যাকে বলছি তা একধরণের মুখোমুখি সম্পর্ক, যা অপরের ধ্বংস চাক অপরের সঙ্গে মিলন, আদতে এই মুখোমুখি সম্পর্কের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিষ্ক্রান্ত হওয়া বা মুক্তিলাভ করা। এই মুক্তি, বস্তুত ধ্বংস হোক মিলন, আদতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের সেই ঐক্য। বস্তুত এই ঐক্যই হল বস্তুর কিম্বা বস্তুরূপী দ্বান্দ্বিক প্রকরণের উদ্দেশ্য অর্থাৎ দ্বন্দ্বের কারণও। অতয়েব সরল নাস্তিবাদ ছাড়া দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আর কোনো গতি নাই যদি না বস্তুকে সরাসরি ঐক্য এবং দ্বন্দ্বকে তার প্রক্রিয়া হিশাবে দেখা হয়। ঐক্য দ্বন্দ্বের কারণ এবং কার্য দুইই, সেই হেতু শুধুমাত্র দ্বন্দ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বস্তুর বিকাশের অর্থাৎ ঐক্যের বিশ্লেষণ করতে সক্ষম, একে বদলাতে নয়। এমনকি দ্বন্দ্ববিচার বস্তু বদলের কাজে সহায়ক জরুরি কলাকৌশল দিতে পারে, কিন্তু বস্তুকে বদলের কাজে প্রধান বিচার্য হচ্ছে তার সম্ভাব্য ঐক্যের শর্তগুলি পর্যবেক্ষণ করা।

কেন হাঙর কর্পোরেটের দোসর জনতা পার্টি ভোট, জনসমর্থন পাচ্ছে, কেন বামপন্থীরা দিনদিন নিরাশার প্রতীক হয়ে উঠছেন, এইসব বস্তাপচা প্রশ্নের সদুত্তর যদিও এই পর্যবেক্ষণে পাওয়া যাবে, তদুপরি আমার উদ্দেশ্য শ্রেণিসংগ্রামকে একুশ শতাব্দীতে আজ সাম্যবাদী সংগ্রামের ব্যর্থ নীতি প্রতিপন্ন করা। শ্রেণি সংগ্রাম যদি শ্রেণি শোষণ বিলুপ্ত করবার সংগ্রাম হয় তবে তা অবশ্যই একইসঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামকে বিলুপ্ত করবার সংগ্রামও। শোষণমূলক বা পালনমূলক, বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যেকার দ্বন্দ্ববিচার যদি শোষণ বিলোপ নির্মাণকর্মের প্রধান তাত্ত্বিক অভিচার হয়, তবে সেই পরিকল্পনা বস্তুত কখনৈ বস্তুর বিকাশকে দিশা বা তীব্রতা দিতে পারে না। পারে না, কারণ এই ক্ষেত্রে 'দ্বন্দ্ব' বলতে কোনো গতিশীল সম্পর্ক মাত্রই নয় যা মিলনও হতে পারে, বরং 'দ্বন্দ্ব' এখানে সাধারণ ভাবেই একপ্রকার একমুখী বা বিপরীতমুখী সংঘাত মাত্র। যদি আমরা সৎ হই তবে 'দ্বন্দ্বতত্ত্বে' 'দ্বন্দ্ব' আর 'সংঘাত'-কে এতটা ক্ষীণ ও সরল ভাবে সমার্থক করে ফেলতে পারি না। পারি না বলেই 'নির্মাণপ্রকল্প'-এ 'ঐক্যের' কিনারা করি, বুঝি 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব' আদতে 'ঐক্যতত্ত্ব'-এরই ডাকনাম। ইওরোপিয় দাস সভ্যতার ইতিহাসের

পরম্পরা আর আফ্রিকা এশিয়া আমেরিকার ইতিহাসের কার্যকারণ ও বিকাশের বিভিন্ন পরম্পরার মধ্যে মৌলিক ফারাক হল ক্রীতদাস-ভূমিদাস-মজুরিদাস সমাজকে শোষণ ও শাসনের মাধ্যমে অনুৎপাদক রাষ্ট্র ও বণিকশ্রেণি এখানে 'প্রগতির' স্বার্থেই একটি কেন্দ্রীভূত শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা প্রচলন করে, মানসিক শ্রম কায়িক শ্রমকে ছিন্ন করে, বাজার সহ উৎপাদকের সকল স্বাধীনতা হরণ করে সশস্ত্র পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে। 'অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্তমূল্য' প্রবন্ধে মার্ক্স দেখাচ্ছেন এই ফারাক প্রকৃতিজনিত। মার্ক্সের মতে একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র নামক শোষণব্যবস্থার উপর গ্রীষ্মমণ্ডলের কৌম সমাজগুলি নির্ভরশীল নয় বলেই সেখানে অবসর অতি বেশি থাকা সত্ত্বেও রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিকাশের তাগিদ সেইসব সমাজে মৌলিক ভাবে গড়ে ওঠে নি। এটি মার্ক্সের দোষ নয়, তাঁর কাছে এটা বলবার মত কোনো তথ্য ছিল না যে এই কৌম পরম্পরার সমাজের জ্ঞান লুঠ করেই পাশ্চাত্যে দাস সভ্যতার আধুনিক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। তাঁর কাছে এটা বলবার মতও কোনো তথ্য ছিল না যে তিনি যে সাম্যবাদী জ্ঞানকাঠামোর কথা তত্ত্বে প্রকল্প করেন, তা ভবিষ্যতের অলোক গহ্বরে নেই, বরং তা ইতিহাসেই হাজির আছে। বিজ্ঞান যেখানে বিশেষের জ্ঞান নয় সাধারণের জ্ঞান। যে জ্ঞানের প্রবাহ শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর। যে জ্ঞান ততটা সরল যতটা হলে সবার হতে পারে। এখানে তাই গণিতও সাহিত্য, দিনের বেলায় সাগরে পথ চিনবার জন্য লাখ লাখ সরল রেখার কাগুজে গণনা নয়, কাব্য। সে কাজ তো এক টুকরো দড়ি দিয়েই হয়।

মার্ক্স দেখাচ্ছেন গ্রীষ্মমণ্ডলে অর্থাৎ এশিয়া আফ্রিকায় মানুষের জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা প্রধানত জীবনধারণের উপকরণ হিশাবে, অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে মানুষের জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা প্রধানত উৎপাদনের হাতিয়ার হিশাবে। এর সঙ্গে তিনি ঐ প্রবন্ধে আরো অনেক কথা লিখছেন ও অতঃপর যে উৎপাদন পদ্ধতির নিয়মনীতি বিচারে হাত দিচ্ছেন যা ঐতিহাসিক প্রকরণে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দাস সভ্যতার আধুনিক উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির সংঘাতের কার্যকারণ। আমরা সার কথা যা বার করতে পারি: প্রকৃতির ভূমিকা যেখানে [অর্থনৈতিক] উৎপাদনের উপকরণ হিশাবে নয় বরং জীবন ধারণের উপকরণ হিশাবে প্রধান, সেই গ্রীষ্মমণ্ডলেই শুধু নয়, বরং দাস সভ্যতার সমান্তরালে এমনকি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও এমন শ্রমবিভাগের সমাজ ও তার স্বতন্ত্র্য ইতিহাস আছে যাকে সরল পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা বলে সরু দাগে লঘু করা হয়েছে। এনক্লোজারে ইওরোপের সেই কৌম সমাজেরই যৌথ জমি সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে হরণ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা হয় এবং এইসব জমিতেই ইংলন্ড, ইতালি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে মার্ক্সের পরিভাষায় এক ধরনের নয়া সামন্তবাদী সম্পর্ককে ভিত্তি করে ধনতান্ত্রিক সমাজ আবির্ভূত হয়। আমরা তত্ত্বগত ভাবে এমন উৎপাদন সম্পর্কের নজির ইতিহাস থেকেই গ্রহণ করতে পারি যেখানে উৎপাদকই উৎপাদন ও শ্রমপ্রক্রিয়ার স্বতন্ত্র্য নিয়ন্ত্রক এবং যারপরনাই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ

উৎপাদক সমাজের ইচ্ছাধীন।

কূপমণ্ডুক বাম প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে এই সমস্যাগুলির আলোচনা নিষিদ্ধ, তাঁদের কাছে এইসব প্রশ্ন দ্বন্দ্বতত্ত্বকে খারিজ করবার সামিল। আদতে এইভাবে বিকাশের বহুমুখী সম্ভাবনাকে ইতিহাসে অস্বীকার করা হয়, অপরের তত্ত্বকে অপমান করতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব ব্যবহৃত হয়। আসল কথা হচ্ছে একটা সরলতর উপায় তখনই কার্যকর হয় যখন উদ্দেশ্যও হয় সরলতর [বা সাধারণ]। সাম্যবাদী সংগ্রামে শ্রেণিসংগ্রাম কৌশল হলে এই সরল উদ্দেশ্য বা প্রকল্পিত ঐক্যই হচ্ছে নীতি। এখানে 'শ্রেণি-ঐক্য' কথাটা সাংঘাতিক হলেও নীতিগত অর্থে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু বিষয়টা আরো সরল হয় যখন সরাসরি সাম্যবাদী শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা দিয়ে আমরা মানব সমাজের এই প্রকল্পিত ঐক্যকে বিচার করি। কৌশল যুঝতে দ্বন্দ্ববিচারের ঠিক বিপরীতে নীতি যুঝতে এই 'ঐক্যবিচার' বলতে এখানে এমন একটি সমাজকে প্রকল্পিত করা বোঝাচ্ছি যা শ্রমবিভাজনকে পারস্পরিক স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল একটি আঞ্চলিক কৌমের আন্তঃআঞ্চলিকতাবাদী সাম্যাবস্থা নির্মাণ করবার সকল হাজির শর্ত, উপাদান চিহ্নিত, প্রস্তুত করে বৈকি।

হাটকে বিপ্লবের প্রকল্পনায় আনার অর্থ হল তেমনই এক ঐক্যের শর্তকে চিহ্নিত করা ও বিকশিত করা। জনতার সামনে রাষ্ট্রকে বিকল করে ফেলবার নীতি তখনই জায়েজ হবে যখন রাষ্ট্রকে বিকল করবার মধ্যে জনতা তার বাস্তবিক স্বাধীনতাকে মূর্ত ভাবে দেখতে পাবেন। এই কাজ বিপ্লবের পরের নয়, বরং বিপ্লবের পরের কাজ বলে একে ফেলে রাখা বিপ্লবকেই এই যুগে মুলতুবি রাখার সমান, বরং তা আসলে আর একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মতই আজকের দিনে বিলোপবাদী ক্ষয়ের নৈতিক রাস্তা। অর্থাৎ শ্রেণিবচ্যুতি নয় কৌমভুক্তিই সাম্যবাদী আন্দোলনে আজকের সরলতম নৈতিক প্রকরণ। অর্থাৎ চাকুরেগিরির অধিকার হাসিল করতে নয় বরং পরস্পর যৌথ ও স্বাধীনভাবে উৎপাদন ও ব্যবসা করবার এবং নিজ গোষ্ঠীর শোষণনিরপেক্ষ পরম্পরা পালন করবার ঐতিহাসিক স্বাধীনতা হাসিল করতেই জনতা কখনো আবার দৃঢ়সংকল্পে যুদ্ধে নামবেন: বৈপ্লবিক আন্দোলনে তত্ত্বগতভাবে এই সত্যের পটভূমিকাই আজকের সম্ভাব্য সফল নীতি নির্ধারিত করতে পারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিবিপ্লবে আজকের বাঙলার বিভিন্ন হাটে কর্পোরেটের গ্রামীণ দোসরদের স্থানীয় নয়া সামন্ত চক্র শোষণমূলক অবস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ তৈরি করলেও এই বিনিময়ক্ষেত্রটির ঐতিহাসিক সমাজ শৃঙ্খলা কৌমের শ্রমবিভাজন ঐতিহাসিক ভাবেই পালনমূলক। এখানে কেউই নিকর্মা পরজীবী নন, সকলেই স্রষ্টা ও বিনিময়কারী, স্বাধীন ভাবে সৃষ্টি ও বিনিময় করেন পরস্পরকে পালনের উদ্দেশ্যে। এই উৎপাদন পদ্ধতি বাজার হারিয়ে কিম্বা নিয়মে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এর ঐতিহাসিক বরাতই

আমাদের সেই উত্তরাধিকার দেয় যা থেকে শ্রেণিসংগ্রামের নীতি হিশাবেই আমরা কৌমকে গ্রহণ ও সফল করে তুলতে পারি। বিনিময়নিরপেক্ষ সাম্যবাদী কারিগর উৎপাদন পদ্ধতির বিশাল বিনিময়ক্ষেত্র হাটকে কর্পোরেট রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত করে তোলার অপর অর্থ তাই সামাজিক উৎপাদন বিতরণের শৃঙ্খলায় স্বাধীন উৎপাদক অর্থাৎ কারিগর ও ব্যবসায়ীর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা। জনতা এই ঝাঁ চকচকে বৈষম্যবাদী ব্যবস্থা বাতিল ক'রে তার পরিবার, সমাজের স্বার্থেই নিজস্ব উৎপাদনী ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ, কৌশল, মুক্ত জ্ঞানপ্রবাহের স্বার্থেই একমাত্র ভদ্রলোকি কোনো রাজনৈতিক অভিচারের সঙ্গে হাত মেলানোর সাহস পুনরায় করবেন। এটি সামাজিক কাজ হিশাবে যতটা সরল, রাজনৈতিক কাজ হিশাবে ততই জটিল। তবু, কোনোকিছুর মতোই এই কাজও অসম্ভব নয় বলেই বিভিন্ন প্রকারেই আজ টলস্তয়ের দুশ্চিন্তাকে সঠিক মনে হলেও তাকে জয় করা সম্ভব; কারণ মানুষ ইতিমধ্যেই সেই স্বপ্ন দেখে ফেলেছে।

"এই যুগের নিকর্ম্মা ফাঁকিদারগণ বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা হস্তপদাদির কর্ম্ম না করিয়া BRAINWORK বা মগজের কাজ করিয়া থাকেন। যে মগজের কাজ মানবজাতির RATIONAL LIFE বা ধর্ম্মজীবনের সহায়তা করে তাহার বিরুদ্ধে কাহারো কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজে শ্রমজীবীদের খাটুনির ফল ঠকাইয়া খাইবার বিবিধ ফাঁকিদারি ফন্দীগুলিকেই BRAINWORK বা মগজের কাজ বলিয়া পেশ করা হয়। গরীব চাষা আদালতে গিয়া যাহাদের জালে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহারাও মগজের কাজ করেন। রোগী আরোগ্য হইবার আশায় যাহাদের হাতে পড়িয়া ধনেপ্রাণে মারা যায় তাহারাও মগজের কাজ করে। হতভাগ্য দেনাদার যাহাদের কাছে ঋণ করিয়া ভিটামাটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহারাও মগজের কাজ করে। যাহারা বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে বসিয়া নতুন নতুন মানুষ মারা কল ও বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কার করিতেছেন তাহারাও মগজের কাজ করিতেছেন। কলির মহাত্ম্যে সভ্য সমাজে এইরূপ অসংখ্য রকম মগজের কাজের জন্য ভূভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভূভারহারীর আসন টলিতে আর কত বিলম্ব আছে জানি না।"

শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত 'বক্কেশ্বরের' এই 'বেয়াকুবি' সমাপ্ত হচ্ছে তেমনই এক দিবাস্বপ্ন দিয়ে। অবিশ্যি ভদ্রলোকেরা তামাক না খাইলে এ স্বপ্নের সম্ভাবনা কস্মিনকালেও পড়িতে পারবেন না: এটি নৈতিক দুঃখও বটে, *"একদিবস আমি সত্যযুগের প্রতীক্ষায় গাঁজার ছিলিমে দম লাগাইয়া দেবাদিদেবের অনুকরণে সমাধিস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তখন অকস্মাৎ আমার অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দেখিলাম, দিগন্ত অন্ধকার করিয়া মহাপ্রলয়ের ঝড় উঠিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন ভীষণ বজ্রাঘাত, উল্কাপাত ও ভূকম্পন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে যত বড় বড় স্তম্ভ, অট্টালিকা ও কলকারখানার গগনচুম্বী চিমনি ও চূড়া সকল চুরমার হইয়া ধূলিসাৎ হইল। ট্রেন সহ রেল লাইন সকল উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত*

হইল। অর্ণবপোত সকলকে সাগরবক্ষ হইতে উড়াইয়া পর্বতশৃঙ্গে নিক্ষেপ করা হইল। প্রলয় প্লাবনে আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ ছোট বড় শহর সকল ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল। তখন সেই ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া বায়ুগামী শ্বেতাঙ্গ পৃষ্ঠে বিদ্যুৎজ্বালাময় নিষ্কোষিত অসি হস্তে এক অগ্নিময় দিব্যপুরুষকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহার কপালে ইংরাজিতে অস্পষ্ট ভাবে কী লেখা আছে, তাহা DEMO কি DEMON ঠিক পড়িতে পারা গেল না। তখন চারিদিক হইতে একটা আর্তধ্বনি উঠিল যে কল্কি অবতার আসিয়াছেন। আমি চিরদিন NON-VIOLENCE বা অহিংসার উপাসক। আমি ভয়বিহ্বল কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে করজোড়ে সেই দিব্যপুরুষকে বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি যে আমার চিরপ্রেমময় হরি! তোমার এ জিঘাংসাময় মূর্তি আমি আর দেখতে পারছি না। সৃষ্টি যে রসাতলে যায় প্রভু! তুমি এই ভীষণ মূর্তি সম্বরণ করো।" তখন ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া এই দৈববাণী হইল - "ভূভারহরণ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমার আগমন। এখন থেকেই সকলকে আবার স্বধর্ম্মনিরত হতে হবে। আজ থেকে পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ।" এই বলিয়া কল্কিদেব অন্তর্ধান হইলেন। প্রকৃতির সকল উপদ্রব মুহূর্ত মধ্যে থামিয়া গেল। অতঃপর দেখিলাম, সভ্যতার তিরোভাব হইয়া প্রাচীন বর্বরতার পুনরাবির্ভাব হইয়াছে, সকলকেই আবার লাঙ্গল ঠেলিতে হইতেছে। জেপলীন, সাবমেরিন, হাউইজার প্রভৃতি বিদ্যাগুলি গুপ্তবিদ্যা হইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধবিদ্যা লুপ্তবিদ্যা হইয়াছে। আর, এই নবযুগের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভূতত্ত্ববিদগণ ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও মৃৎস্তরের পরীক্ষা করিয়া অতীত কলিযুগের লুপ্ত সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন [ইনশাল্লাহ]"

বাঙলার হাটে ভিড় বাড়ুক। 'স্বাধীন' উৎপাদক, 'স্বাধীন' বিক্রেতার জয় হোক। বিপ্লবে মূর্চ্ছা যাক বিজ্ঞানের সব অভিশাপ, সাহিত্য আর সাধারণ জ্ঞান ততটা শক্তিশালী হোক যতখানি হলে আমরা গৌরচন্দ্রের সাধনায় সকল ঈর্ষা দ্বেষ লোভ অসুখ আর শোষণের ভুভার নিষ্ক্রান্ত করতে পারি। জাতীয়তাবাদী ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্পোরেট রাষ্ট্রের অবৈধ সাম্রাজ্য ধ্বংস করে আমাদের বহুত্ববাদী ধর্ম, কৌম সমাজ বিপ্লবের সংগ্রামে দীর্ঘজীবী হোক। আমরা প্রস্তুতি আরম্ভ করি।

আমার হাট বোঝা

বিশ্বেন্দু নন্দ

১৭৫৭ উত্তর সময়ে উপনিবেশিক নবজাগরিত ইউরোফিল বাংলায় সাহিত্য, জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা কাঠামোর ভিত্তি কেন্দ্রিভূত কর্পোরেট কারখানা আর শ্রম ব্যবস্থাপনা। এই কাঠামোর তাত্ত্বিক এন্ড্রু উরে, চার্লস ব্যাবেজকে ধরে বিকশিত হয়েছে কেন্দ্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শ্রম নির্মূলীকরণ প্রকল্প - যার বর্তমান রূপ এআই, রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস এবং গ্রামীণ কৃষ্টির বিলয়। ভদ্রবিত্তের দু'একটা হাতেগোণা ব্যতিক্রমী উপন্যাস বাদ দিলে প্রত্যেকটির মৌলিক সুর শহুরীকরণ, গ্রামদ্বেষ এবং গ্রাম থেকে শহর অভিবাসন। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ গ্রাম ব্যবস্থা বয়ানের অন্যতম সেরা কারিগর নামে আজও পরিচিত। তার উপন্যাসে নিরন্ন বামুন পরিবারের নতুন প্রজন্মের গ্রাম পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠার বয়ান আর শহরে চলে আসার আপ্রাণ চেষ্টা কাহিনী। অপু-দুর্গার ট্রেন দেখা উপনিবেশিক লুঠেরা, গণহত্যাকারী, ম্যাসকুলিন আধুনিক ব্যবস্থার রূপক। দক্ষিণ এশিয়া লুঠের কাঠামো পরিচালন করা বঙ্গীয় সমাজতাত্ত্বিকদের মূল ভাবনা সামাজিক গতিশীলতা - অর্থাৎ বিনয় ঘোষ কথিত 'অন্ধকারের প্রতিভূ' গ্রাম ব্যবস্থার স্বাধীনতাকে লাথি মেরে শহুরে কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্র আর কর্পোরেট নির্ভর রাষ্ট্র কাঠামোয় থিতু হয়ে কেন্দ্রিভবন, লুঠ আর কর্পোরেট কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় কর্পোরেট শহুরে কাঠামোর গোটা ব্যবস্থাই আদতে ইওরোপের স্বার্থবাহী।

তারমানে এটা নয় যে উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তের ভাবনার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্ঘ, যারা উপনিবেশের কেন্দ্রিভবন, মহিলাফোবিয়া, ছোটলোকফোবিয়া, বৈচিত্রফোবিয়া, মুসলমান-ইসলামফোবিয়ার উত্তরসূরী, তারা নতুন কিছু ভাবছে। দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিকভাবে ডান-বাম-মধ্য রাজনীতিটিই ইওরোপের প্রাচ্যবাদী কাঠামো নির্ভর। প্রত্যেকের কাছে অসামান্য বৈচিত্রময় গ্রাম কাঠামো একটা এনিগমা। তাই প্রত্যেকে দুঃসাহসিক তাত্ত্বিকতায় গ্রাম কাঠ্যামো বদলাতে কোমর বেঁধেছে।

প্রায় দু'হাজার বছর ধরে ইওরোপ এবং আমেরিকায় গণহত্যা আর লুঠের তাগিদে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী খ্রিষ্ট ধর্ম [যার সঙ্গে খ্রিষ্টের থাপ্পড় খেলে আরেক গাল বাড়িয়ে দেওয়ার বার্তার যোগ নেই] পাগান বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন কাঠামো ধ্বংস করে ইসলামোফোবিক ক্রুসেড যুদ্ধের উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিচারক উইলিয়াম জোনস বাংলায় বামুন খুঁজে না পেয়ে বদ্যিকে সংস্কৃত মাস্টার বানিয়ে মনুকে মহিলাফোবিক ভদ্রবিত্তের সমাজে জলচল করলেন মহিলাদের সম্পত্তি আর জমিদারির অধিকার কেড়ে নেওয়া সময়ের আশেপাশে। জোনস আর

মূলারের আর্যত্ব, উরে আর ব্যবেজের বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন কাঠামো ধ্বংস বার্তার উত্তরাধিকার বহন করা বঙ্গজ ইওরোপচাঁটা শিক্ষিত সার্টিফিকেটওয়ালা প্রগতিশীল-ব্রাহ্ম-বাম-সঙ্ঘী ভদ্রবিত্ত অনুগামীদের সামগ্রিক মনন নির্মিত হয়েছে পলাশী পূর্ব সময়ের ক্রুসেডিয় ইসলামোফোবিয়ায়, মহিলাফোবিয়ায়, বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ফোবিয়ায়। বঙ্গজ ভদ্রবিত্ত বিশ্বাস করে এ বিশ্বে কর্পোরেটই সত্য, তার বাইরে আর সব ফক্কা। ছোটলকেরা যে কোনও বাহানায় বধ্য।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। আমার বাবা-মা ছয়ের দশকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তিয় সামাজিক উত্তরণ সূত্র মান্য করে 'অন্ধকারের প্রতিভূ' উপকূল মেদিনীপুর থেকে 'প্রগতির লীলাভূমি' কলকাতা শহরে চলে আসেন। আমার দুই দিকের উদ্বৃত্তভোগী পরিবারের পরম্পরা মেনে দুজনের মনে-প্রাণে ভদ্রবিত্ততার চূড়ান্ত, ইস্কুলে চাকরি করেছেন, বাম রাজনীতির অংশ হয়েছেন। আমার বাল্যকাল কেটেছে উপকূল মেদিনীপুর আর মেদিনীপুর সংলগ্ন চব্বিশ পরগণার গ্রামীন অঞ্চলে। জন্মের এক দশক পরে, বামফ্রন্টের ক্ষমতার আসার বছর স্থায়ীভাবে কলকাতা আগমন। বাবা-মা'র বন্ধুদের হ্যাটা খেয়ে উড়ে যায় মাটিতে পা মেদিনীপুরী ভুত বহুচেষ্টায় উপহাসের মেদিনীপুরী বচন ঝেড়ে নবজাগরণী ভদ্রবিত্তীয় হেজিমনির অংশিদার হিসেবে ছাত্র রাজনীতি, বাম রাজনীতি, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের ধাক্কায় লোকসংস্কৃতি চর্চা, ঝাড়গ্রামে থাকা, এনজিওতে চাকরি, সাংবাদিকতার রাস্তা মাড়ানো ভদ্রবিত্তিয় ভাইসেসে দেড় দশক ডুবে থেকে ১৯৯৬-তে হকার সংগঠনে যোগদান। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আর ঝাড়গাঁ-বাঁকুড়া-পুরুল্যা-বীরভূমি দর্শন জন্মের তিন দশকেই রাষ্ট্র-কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সংখ্যালঘু মায়োপিক, ফোবিয়ার ঝুড়ি পিঠে বাঁধা নবজাগরণী উত্তরাধিকারের ঘেরাটোপ থেকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল। মা-বাবা বন্ধুদের বলতেই পারেন না ছেলে হকার সংগঠন করে। অথচ তারা ছয়ের দশকে জেল খেটেছেন, বহু আন্দোলনে লাল ঝাণ্ডা কাঁধে আমাকে নিয়ে রাস্তায় রাত কাটিয়েছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন খুবই নিম্নভদ্রবিত্তীয় [ক্লাস নাইনে, ১৯৮১, বন্ধুদের দেখাদেখি কোরিয়ান গ্যাভার্ডিনের প্যান্ট পরতে চাইলে বাবা বলেছিলেন সকলে সুতির কাপড় পরে তুমিও তাই পরবে], মণীষা থেকে নিয়মিত বই কিনতেন, মা ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেতেন - কিন্তু এনজিওর চাকরি ছেড়ে হকার ইউনিয়ন করা মা-বাবা আজও মেনে নিয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বাবা-মা অথবা আমায় যিনি বিয়ে করবেন, প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ, তারা আমার এই ইচ্ছেয় বাধা হয়ে দাঁড়ান নি।

হকার ইউনিয়নে যোগ দেওয়া ছাড়া সব কটাই আদতে ভদ্রবিত্তীয় সামাজিক প্রবণতা। হকার ইউনিয়নের সঙ্গী না হলে জ্ঞানগঞ্জ যে হাট সমীক্ষা করেছে, তার ভাবনাই মাথায় আসত না। প্রথমে হকার সঙ্গঠন, পরে কারিগর সঙ্গঠনের সঙ্গী হয়ে বুঝলাম কর্পোরেট

উৎপাদন কাঠামোর বাইরেও বিশাল বিকেন্দ্রিভূত সমবায়িক উৎপাদন কাঠামো সচল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ। শহরে হকার আর গ্রামের হাট, গঞ্জ, বাজারই দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতির একমাত্র চালিকাশক্তি। ২০০০-এ কলকাতার হকার অর্থনীতি সমীক্ষা এবং ২০১৪-য় পরম্পরার কারিগর অর্থনীতি সমীক্ষায় বুঝলাম, কেন আজও বর্ষার মরশুম দেরি করে শুরু হলে কর্পোরেট জিডিপির পতন নিশ্চিত হয়। দীপঙ্কর দে, অরূপশঙ্কর মৈত্রের তাত্ত্বিকতায় ছোটলোকের হকার কারিগর চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণা আমাদের বুঝতে শেখাল কেন ২০০৮ এবং ২০১৬র দুটো বিশাল অর্থনৈতিক ধাক্কা দক্ষিণ এশিয়া খুব সহজেই সামলে উঠতে পেরেছিল। সংগঠন করার সুবাদে নতুন করে বাংলা জুড়ে হাট দেখলাম, চিনলাম তার অর্থনীতি বুঝলাম।

হকার সঙ্গঠনে যুক্ত হওয়ার তিন দশক পর জ্ঞানগঞ্জের বন্ধুদের নিয়ে হাট সমীক্ষার পরিকল্পনা - কারন দুটো। জ্ঞানগঞ্জের অধিকাংশ সদস্য ২৫ বছরের নিচে। তারা বাংলার হাট ব্যবস্থা সেভাবে দেখেছেন বলে মনে হয় নি। হাট না দেখলে গ্রামের প্রাণ বোঝা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত হাট আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, কর্পোরেট অর্থনীতি কেন হাটে থাকা অসম্ভব। অর্থাৎ বিকেন্দ্রিত অর্থনীতির বোঝার প্রায়োগিক জায়গা, হাট।

বাংলার নারী অধিকার আন্দোলনের এক সঙ্গঠন জ্ঞানগঞ্জকে বীরভূম, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তাদের কাজের অঞ্চলে থেকে হাটগুলোকে পর্যালোচনা করার সুযোগ করে দিলেন। হাট সমীক্ষার সূচনা করলেন চন্দন মুখোপাধ্যায় আর তীর্থরাজ ত্রিবেদী। ২০২৩-এ তীর্থরাজ জ্ঞানগঞ্জের এক মাসিক সভায় বাংলার কৃষি ব্যবস্থার খোঁজে তার হাতে কলমে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি শেয়ার করেছিলেন। সেটাই তার সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জের প্রথম আলাপ। তার পরে দুটো উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের অংশিদার হলেন। তার সঙ্গে দিনাজপুরের ফতেপুর, চান্দোল হাটে গিয়েছি আমি আর অত্রি। ধনকৈলে গিয়েছেন শুধু তীর্থরাজ। তীর্থরাজের এই তাত্ত্বিক লেখা শুধু ব্যতিক্রমীই না, গভীর অনুসন্ধানের ফসলও বটে। তীর্থরাজ দুটো হাটের অর্থনীতির সমীক্ষা উপস্থাপন করেছেন। জ্ঞানগঞ্জের নতুন বন্ধুরা উপনিবেশকে দেখার চোখ, পালটে দিচ্ছেন - তারাই আমাদের মত বুড়োদের শিক্ষক। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা তাদের হাতে নিরাপদ।

তীর্থরাজের লেখায় আমার শুধু জোড়া কথা একটাই - হাটের অস্থায়ী কাঠামোই কর্পোরেট দর্শন বিরোধী। কর্পোরেটের একটা কারখানায় অতি উৎপাদন করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভোক্তার সঙ্গে যোগাযোগবিহীন বিতরণ ব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়। হাটের এই অসামান্য উদ্ভাবনী কাঠামোর ফলে হাজারো চেষ্টা করেও কর্পোরেটেরা হাট ব্যবস্থায় সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারে নি।

ভবিষ্যতে বন্ধুরা উৎসাহ দিলে বিশদে হাটের সঙ্গে জুড়ে থাকা উৎপাদন বৈচিত্র

এবং তার কাঠামো খোঁজের ইচ্ছে রইল। হাট আসলে চলতাফেরতা উপনিবেশপূর্ব সামাজিক-বাজার কাঠামো; সে পলাশীর ২৬৮ বছরের, উপনিবেশিক গণহত্যা, অতিচার, অনাচার, গ্রামীন উচ্ছেদ, সম্পদ দখলদারি, জাতিরাষ্ট্রের সরাসরি বৈরিতা, কর্পোরেটের মুহুর্মুহু আক্রমণ সহ্য করে আজও টিকে আছে।

ভাল থাকুন। উপনিবেশের পতন হোক।

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলা, দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী সমীক্ষা, বহু রামায়ণ বিষয়ক সমীক্ষা আর চলতি পুথি হল উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩১। বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব
জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা
জ্ঞা ন গ ঞ্জ